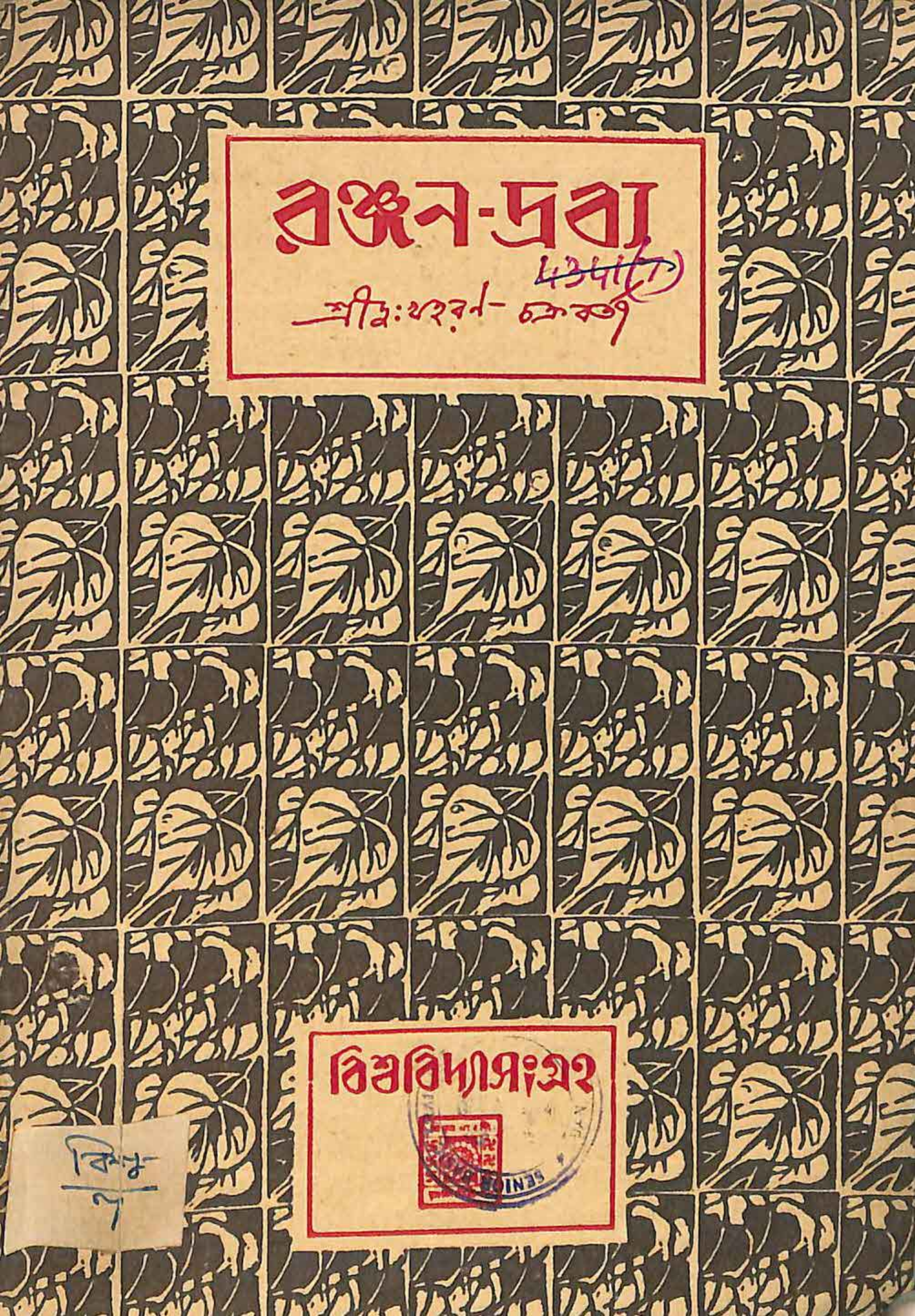

রঞ্জন-দ্রব্য

~~৫৩৫৮~~(৭)

শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ব-
৭

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

॥ ১৩৫২ ॥

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ ।

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

~~4341(7)~~

রঞ্জন-দ্রব্য

শ্রীদুঃখহরণ- চক্রবর্তী

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
BANIPUR

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

West Bengal
~~12098~~ 6796

প্রকাশ : ১ ফাল্গুন, ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ়, ১৩৫৩

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের উৎসাহ না পাইলে এই পুস্তক প্রণয়ন করা সম্ভবপর হইত না। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা থাকিলেও উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দের অভাবে পশ্চাৎপদ হইতে হয়। অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া আমাকে শ্রুতিকঠোর শব্দের ব্যবহার করিতে হইয়াছে, তবে সর্বত্রই ইংরেজি শব্দটিও দিয়াছি। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দ হুবহু সেইভাবেই ব্যবহার করিয়াছি। উদ্ভিজ্জ রঞ্জক পদার্থের আলোচনাকালে প্রত্যেকটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হইয়াছে।

নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদি হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

১. অনুকূলচন্দ্র সরকার: "রঞ্জনশিল্পের ইতিহাস"—প্রতিভা, ১৩২১
২. অনুকূলচন্দ্র সরকার: "দেশীয় পুষ্পজাত রঞ্জন উপকরণ" —ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ১৩২১ পৃ. ৪৫-৫৬, ২৪৪-২৫১।
৩. Watt: *Dictionary of Economic Products of India.*
৪. Perkin and Everest: *Natural Organic Colouring matters.*
৫. Benedikt: *The Chemistry of the coal-tar colours* —translated by Knecht.
৬. Cain and Thorpe: *The Synthetic dyestuffs.*
৭. Thorpe and Ingold: *Vat Colours.*
৮. Georgivics: *Chemistry of dyestuffs.*

সায়েন্স কলেজ, কলিকাতা
১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫০

শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী

সূচী

প্রকৃতিজাত রঞ্জক পদার্থ … ৫

কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের প্রচলন … ২৩

কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও গুণাগুণ … ৩৫

কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের প্রস্তুতপ্রণালী … ৪৬

১

প্রকৃতিজাত রঞ্জক পদার্থ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই পৃথিবীর সর্বত্র রঞ্জন-দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কোন্ দেশে কখন কি কি রঞ্জন-পদার্থের প্রথম প্রচলন হয় তাহার প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে ঐতিহাসিকগণের মতে ভারতবর্ষই বোধ হয় এ-বিষয়ে অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে রঞ্জন-দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে যে-সব বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে ভারতবর্ষে রঞ্জন-শিল্পের সমধিক প্রসার হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষের অরণ্যে কান্তারে অযত্নবর্ধিত অগণিত তরু-লতাদির পত্রে, পুষ্পে, বল্কলে, মূলে স্বভাবজাত রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান আছে এবং প্রাচীনকাল হইতে এইগুলি রঙ্গক (pigment) হিসাবে প্রথমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পৃথিবীর সর্বত্রই ক্রীড়ামোদিগণ অনায়াসলভ্য রঞ্জক পদার্থে গাত্রাদি লেপন করিয়া বীভৎস আকৃতি করিতে ভালবাসিত এবং সামরিক বেশ হিসাবে এই ভয়াবহ মূর্তির উল্লেখ বহু প্রাচীন গ্রন্থেই পাওয়া যায়। বর্তমান সময়েও অপেক্ষাকৃত অসভ্য পার্বত্যজাতিগণের মধ্যে এই দৃশ্য বিরল নহে।

ক্রমে ক্রমে পরিধেয় বস্ত্রাদির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের সৌন্দর্য-স্পৃহায় চিত্তাকর্ষক রঙে বেশ রঞ্জিত করার প্রথা দেখা দিল— পত্রপুষ্পের নির্যাসের দ্বারা নীল, পীত, লোহিত, অলক্তক রঙে রঞ্জিত বেশ উৎসবাদির ও ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হইল ; কিন্তু দেখা গেল এইসব রঙ চিরস্থায়ী নহে, জলের সংস্পর্শে ইহা প্রক্ষালিত হইয়া যায়। ভারতীয়গণই সর্বপ্রথমে রাগবন্ধকের (mordant) আবিষ্কার করেন— তাঁহাদেরই অনুসন্ধানের ফলে

ফটকিরি আবিষ্কৃত হইল। ফটকিরি রঙকে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ করিতে পারে এবং ফটকিরির সাহায্যে রঞ্জিত বস্ত্রাদির রঙ পাকা হয়, জলের সংস্পর্শে ম্লান বা হীনপ্রভ হয় না। ফটকিরির সাহায্যে ভারতবর্ষে উদ্ভিজ্জ রঞ্জক পদার্থ দ্বারা বস্ত্রাদি পাকা রঙে রঞ্জিত হইতে লাগিল এবং তদবধি শিল্প হিসাবে রঞ্জন-শিল্প অন্যতম আসন গ্রহণ করিল। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে লিখিত গ্রন্থে ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্‌ (Bancroft) স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, 'রঞ্জন-শিল্পের ইতিহাসে ফটকিরির আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এ-বিষয়ে রঞ্জন-শিল্প ভারতবর্ষের নিকট সমধিক ঋণী।'

পৃথিবীর সমস্ত দেশই কোনও কোনও প্রাকৃতিক রঞ্জক পদার্থকে নিজস্ব বলিয়া দাবি করিতে পারে, তবে ইহার প্রত্যেকটি রঞ্জন-শিল্পের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। স্বাভাবিক নীতি অনুসারে অল্পদিন ব্যবহারের পরই নিকৃষ্ট রঞ্জক পদার্থ অবজ্ঞাত হইয়াছে, উৎকৃষ্টটি বিদেশজাত হইলেও তাহার স্থান দখল করিয়াছে, এবং এইভাবে ক্রমে ক্রমে মাত্র কয়েকটি উদ্ভিজ্জ রঞ্জক পদার্থ শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের আবিষ্কারের পরে তাহাদের বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে ও স্থায়িত্বে মুগ্ধ হইয়া শিল্পিগণ প্রাকৃতিক রঞ্জকের ব্যবহার কমাইয়া দিলেন, এবং কালক্রমে প্রকৃতিজাত রঞ্জকের বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। মঞ্জিষ্ঠা ও নীল বহুদিবস পর্যন্ত উৎকৃষ্ট রঞ্জকভাবে খ্যাতিলাভ করিলেও, পরে কৃত্রিম রঞ্জকের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারাও পরাভূত হইয়াছে। তথাপি দেশপ্রী।তর জন্য, অথবা ধর্মকর্মের প্রধান অঙ্গ হিসাবে, অথবা কুটীরশিল্প হিসাবে এখনও স্থানীয় প্রকৃতিজাত রঞ্জক পদার্থের ব্যবহার বহু দেশে প্রচলিত আছে।

রঞ্জন-কলা অর্থকর শিল্প হিসাবে ভারতবর্ষেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐতিহাসিকগণের মতে অতি প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে বস্ত্রাদি নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিক্রীত হইত, এবং ভারতবর্ষের নিকটবর্তী স্থানে সমুদ্রপথে লাভজনক ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দুগণের দেবতাগণ কেহ পীতবর্ণ

কেহ নীলবর্ণ পরিচ্ছেদে শোভিত থাকিতেন বলিয়া পীতাম্বর, নীলাম্বর প্রভৃতি নামে পরিচিত। পীতবর্ণ পরিচ্ছদই বৌদ্ধভিক্ষুগণের পরিধেয় ছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষই রঞ্জন-শিল্পের কেন্দ্রস্থান ছিল। এই শিল্প ভারতবর্ষ হইতে আরব ও পারস্য, শ্যাম ও মালয়দ্বীপপুঞ্জ এবং আরব বণিকগণের সাহায্যে ফিনিসীয় ও মিশর দেশে বিস্তৃতিলাভ করে। প্রাকৃতিক রঞ্জন-উপকরণের সাহায্যে মিশরবাসিগণ এক সময়ে রঞ্জন-শিল্পে উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বহু প্রাচীন শবাধারে সংরক্ষিত শবের পরিহিত বস্ত্রাদি প্রাকৃতিক রঞ্জকে রঞ্জিত তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

পরে গ্রীস ও রোমে ও ক্রমে ক্রমে সুদূর পাশ্চাত্য দেশে প্রাকৃতিক রঞ্জন-দ্রব্যের প্রচলন হয়, তবে তৎকালে রঞ্জিত বস্ত্রাদির মহার্ঘতার জন্য উহা সাধারণ লোকের আয়ত্তাধীন ছিল না। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রঞ্জন-শিল্প এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তবাসী ইহুদিগণের একচেটিয়া ছিল এবং ব্যবসায় নিজেদের করায়ত্ত রাখিবার জন্য এই শিল্পকে তাঁহারা সযত্নে গুপ্তবিদ্যার ন্যায় গোপন রাখিয়াছিলেন, কাহাকেও রঞ্জন-বিধি শিক্ষা দিতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইতেন। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ইউরোপে রঞ্জন-শিল্প উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করে। ১৪৭২ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এড্ওআর্ড্ একদল রঞ্জন-শিল্পী আনাইয়া লণ্ডন শহরে একটি কোম্পানি স্থাপনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। উত্তমাশা অন্তরীপ ও আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে ভারতবর্ষ ও আমেরিকা হইতে প্রাকৃতিক রঞ্জনোপকরণ প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইতে আরম্ভ হয় এবং কোনও কোনও প্রকার উদ্ভিদের চাষও সুরু হয়।

পৃথিবীর সর্বত্র সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে-সব অজস্র প্রাকৃতিক রঞ্জন-পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহাদের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। দীর্ঘদিন অব্যবহারের জন্য ভারতবর্ষজাত রঞ্জন-দ্রব্যগুলির নাম পর্যন্ত আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

উদ্ভিজ্জ রঞ্জক দ্রব্যকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ

(১) **পুষ্পজাত রঞ্জন-দ্রব্য**— পুষ্পজাত রঞ্জন-দ্রব্য ভারতবর্ষে বিশেষ প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য শিল্পিগণ ভারতজাত কুসুমফুল এবং কুম্‌কুম্‌ ব্যতিরেকে পুষ্পজাত অন্য কোনও রঞ্জন-উপকরণের ব্যবহার অবগত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(২) **বৃক্ষকাষ্ঠ ও বল্কল**— রঞ্জনের জন্য নানাবিধ কাষ্ঠের ব্যবহার ছিল, তন্মধ্যে আমেরিকাস্থ লগ কাষ্ঠ, ব্রেজিলের ব্রেজিল কাষ্ঠ, পিচ কাষ্ঠ, সপান কাষ্ঠ (sapan wood), ক্যাম কাষ্ঠ (cam wood), বার কাষ্ঠ (bar wood), পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ-জাত 'ওল্ড ফুস্টিক' (old fustic), স্যাণ্ডার্‌স্‌ কাষ্ঠ (sanders wood) ও কাঁঠাল কাষ্ঠের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সপান কাষ্ঠ বঙ্গদেশে 'বকম' কাষ্ঠ নামে পরিচিত। পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর বকম কাষ্ঠ ইউরোপে প্রেরিত হইত। স্যাণ্ডার্‌স্‌ কাষ্ঠ রক্তচন্দন কাষ্ঠেরই নামান্তর এবং ভারতবর্ষেও এই কাষ্ঠ রঞ্জন-কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। ভারতে ও জাভায় কাঁঠাল কাষ্ঠ ফটকিরির সংযোগে বস্ত্রাদি পীতবর্ণে রঞ্জিত করিবার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

বল্কলের মধ্যে আমেরিকার উত্তর প্রদেশস্থ ওক (oak) জাতীয় বৃক্ষের বল্কল 'কোয়েরসিট্রন বার্ক' (quercitron bark) বস্ত্রাদি উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। চীনদেশজাত লো-কাও (Lo-kao) নামক মূল্যবান হরিৎ রঞ্জন দ্রব্য উদ্ভিদের বল্কল হইতে প্রস্তুত।

(৩) **মূল**— মূলের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য মঞ্জিষ্ঠা। দক্ষিণ ভারতে ও মহীশূরে রক্তপীত নামক একপ্রকার বৃক্ষের মূলের বল্কলও রঞ্জন-কার্যে ব্যবহৃত হইত। হরিদ্রাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) **বৃক্ষপত্র** অথবা বৃক্ষের সমস্ত অংশ ব্যবহার করারও রীতি আছে। নীল প্রস্তুতের জন্য বৃক্ষের সমস্ত অংশই লওয়া হয়। ইউরোপের প্রাচীনতম রঞ্জন-দ্রব্য 'ওয়েল্ড' (weld) বৃক্ষের সমস্ত অংশেই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

শেষোক্ত রঞ্জন-দ্রব্য জুলিয়াস সিজারের সময়েও ব্যবহৃত হইত বলিয়া প্রবাদ আছে।

প্রসাধনের জন্য মেহেদি পাতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেহেদি পাতার চূর্ণ ভারতবর্ষের বাজারে পণ্যহিসাবে বিক্রীত হয়। নখের অগ্রভাগ, হস্ত, পদ এবং চুল নারাঙ্গী রঙে রঞ্জিত করিবার জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই মেহেদি পাতা ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ইহা ছাড়া নানাজাতীয় ফল, যেমন— লটকান ফল (annatto কিংবা arnotto), পারস্যদেশের জাম, পেঁয়াজের খোসা প্রভৃতিও রঞ্জন-কার্যোপযোগী ছিল।

খয়ের ও কসায়িন (tannin) জাতীয় জিনিসও রঞ্জন-কার্যের জন্য পূর্বে বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিল। অধুনা সৈনিকদের পোশাকের নিমিত্ত পশমের উপর খাকি রঙ করিবার জন্য তুঁতে (copper sulphate) সহযোগে খয়ের ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে কসায়িন উপকরণের অভাব নাই এবং ইহা লৌহসংযোগে অথবা কখনও ২।৩ প্রকার রাগবন্ধকের সহিত ব্যবহৃত হইত।

উপরোক্ত তালিকায় মাত্র কয়েকটির নামোল্লেখ করা হইল, ইহা ব্যতীত অনেক উদ্ভিজ্জ পদার্থের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। রাসায়নিক গবেষণায় ইহা ছাড়াও অসংখ্য উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যেগুলির পত্র, পুষ্প, ফুল কিংবা বল্কলের মধ্যে রঞ্জন দ্রব্য অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

প্রাকৃতিক রঞ্জন-পদার্থ যে কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতেই সংগৃহীত হইত তাহা নহে। প্রাচীন গ্রন্থে জান্তব রঞ্জন-পদার্থেরও ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ফিনিসীয় দেশে শামুক হইতে প্রাপ্ত 'টিরিয়ান পার্পল' নামক রক্তাভ বেগুনী রঙ ও আমেরিকাস্থ মেক্সিকোতে এক প্রকার কীটজাত 'কোচিনীল' নামক রঙ রঞ্জন-শিল্পে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। কীটজাত লাক্ষা রঙও বহুপ্রাচীন এবং প্রাচ্যদেশে 'কোচিনীলে'র ন্যায় ইহার বহুল প্রচলন ছিল। লাক্ষা রঙ ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইত।

প্রাচীন কেরমেস (kermes) রঙও কীটজাত। যদিও কেরমেস রঙ Moses বা মুশার সময়ও ব্যবহৃত হইত এবং বাইবেলেও ইহার উল্লেখ আছে, ইহা 'কোচিনীল' অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের। ব্যান্‌ক্রফ্‌টের মতে ১২ পাউণ্ড 'কেরমেস' রঙ এক পাউণ্ড 'কোচিনীল' রঙের সমকক্ষ। 'গোরোচনা' অথবা 'পিউরী' নামে প্রচলিত রঙ গরুর মূত্র হইতে সংগৃহীত হয়।

নিম্নে কয়েকটি উদ্ভিজ্জ এবং কয়েকটি জান্তব রঞ্জক পদার্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

পুষ্পজাত রঞ্জক পদার্থ

(১) **পলাশফুল** (Butea frondosa)— ইহা ভারতবর্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের অধিকাংশ স্থলেই অযত্নবর্ধিত বন্য পলাশবৃক্ষ দেখা যায়। কিংশুক, যজ্ঞীয়, রক্তপুষ্পক, ঢাকবৃক্ষ প্রভৃতি ইহার নামান্তর। বোধ হয় এই বৃক্ষের প্রাচুর্যের জন্যই মুর্শিদাবাদ জেলায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র পলাশী নামে খ্যাত এবং 'ঢাক' বৃক্ষের জন্যই ঢাকা জিলার নাম। বসন্তকালে পলাশফুল প্রস্ফুটিত হয় এবং পুষ্পোদ্গমের সঙ্গে পলাশবৃক্ষ পত্রবিহীন হয় ও লোহিতবর্ণ পুষ্পস্তবকে আবৃত হইয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ করে। পলাশফুল রক্তবর্ণ এবং গন্ধহীন এবং এইজন্যই কবিগণ উপমাস্বরূপ বলিয়া থাকেন, নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ ; নয়নাভিরাম হইলেও গন্ধহীনতার জন্যই ইহার অনাদর।

রঞ্জন-কার্যে পলাশফুলের ব্যবহার বহুদিন হইতেই প্রচলিত আছে, বাসন্তী-পূর্ণিমার সময় বস্ত্রাদি পীতবর্ণে রঞ্জিত করিতে ইহার বহুল প্রচলন ছিল বলিয়াই পীত রঙকে 'বাসন্তী রঙ' বলা হয়। তবে এই রঙ আদৌ পাকা নহে, ইহা সহজেই ধৌত করা যায়। তথাপি এখনও রঞ্জনের জন্য ইহা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়।

পলাশফুলের কেবলমাত্র পাপড়ি হইতেই রঙ পাওয়া যায়। ফুলগুলি

উষ্ণ জলে সিক্ত করিলেই পীতবর্ণ জল পাওয়া যায় এবং ঐ জলে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা হয়। রেশমী বস্ত্র পূর্বে ফটকিরির জলে সিক্ত করিয়া রঞ্জিত করিলে পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত হয়। পলাশপুষ্পজাত রঙ অস্থায়ী এবং হীনপ্রভ বলিয়া পাশ্চাত্যশিল্পে ইহার প্রচলন ছিল না।

(২) **কুসুমফুল** (**Carthamus tinctorius**)— পুষ্পজাত রঞ্জন-পদার্থের মধ্যে কুসুমফুল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিশেষ আদৃত হইয়া আসিতেছে। পৌষ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কুসুমফুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা 'কুসুম্ভ' ফুল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কৃত্রিম রঙ প্রচলনের পরেও কুসুমফুলের ব্যবহার একেবারে লুপ্ত হয় নাই, এখনও বঙ্গদেশের ঢাকা জিলায়, আসামের সুরমা উপত্যকায়, মণিপুরে, মধ্যপ্রদেশে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মিরাটে, এবং অন্যান্য অনেক স্থানে কুসুমফুলের চাষ হইয়া থাকে। ইউরোপে ইহা 'safflower' নামে পরিচিত। পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে যেসব প্রাকৃতিক রঙ ইউরোপে প্রেরিত হইত, তন্মধ্যে নীলের পরই কুসুমফুলের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। খ্রীস্টজন্মের দুইশতাধিক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে নীত হইয়া চীনদেশে এবং তথা হইতে জাপানে কুসুমফুলের চাষ আরম্ভ হয়। কথিত আছে, মিশর দেশের প্রাচীনকালের রক্ষিত শবাধারের মধ্যে শবের পরিহিত বস্ত্রাদি প্রায়শই কুসুমফুলের দ্বারা রঞ্জিত।

কুসুমফুল রঞ্জনের জন্য ব্যবহার করিতে হইলে প্রথমে ফুলগুলি উত্তমরূপে নিষ্পেষিত করিয়া সামান্য অম্লমিশ্রিত জল দিয়া ধৌত করিয়া লইতে হয়— ইহাতে ফুলের অভ্যন্তরস্থ অপ্রয়োজনীয় পীত রঙ জলের সহিত দ্রবীভূত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ধৌতজল সম্পূর্ণভাবে বর্ণহীন হইলে ফুল রঞ্জনের জন্য উপযোগী হয়। ফুলের লোহিত রঞ্জক পদার্থ ক্ষারমিশ্রিত জলে দ্রবীভূত হয়, সুতরাং জলের মধ্যে সাজিমাটি দিয়া সেই জলে উক্তপ্রকারে ধৌত কুসুমফুল সিক্ত করিলেই জল লোহিতবর্ণ হয় এবং সেই জলে কার্পাসবস্ত্র

উজ্জ্বল লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করা হয়। বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের জন্য লেবুর রস দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত আছে। রেশম বস্ত্র এই প্রকারে উজ্জ্বল গোলাপী রঙে রঞ্জিত করা যায়।

(৩) **শেফালিকা ফুল** (**Nictanthis arbortristis**)— শেফালিকা, পারিজাতক, রজনীহাস এক পর্যায়ভুক্ত। হিমালয়ের পাদদেশে এবং টিরাই পাহাড়ে অসংখ্য বন্য শেফালিকা বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। শেফালিকা শারদীয় পুষ্প, ইহা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুটিত হয় এবং সূর্যোদয়ের পরে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। শেফালিকা পুষ্পের বোঁটা রঙের জন্য ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক শেফালিকা পুষ্প পূর্বে মণ-দরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিক্রীত হইত। বর্তমানেও ইহা কুটীরশিল্প হিসাবে ভারতের অনেক পল্লীতে রঞ্জন-শিল্পের জন্য অল্পাধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম রঞ্জন-পদার্থের আবির্ভাবের পূর্বে সিংহলে ধর্মযাজকগণের পরিচ্ছদ শেফালিকা পুষ্পে রঞ্জিত হইত।

ফুটন্ত জলে শুষ্ক পুষ্পগুলি কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিলেই জল পীতবর্ণ হয় এবং বস্ত্রাদি উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত করা যায়। এই রং বিশেষ স্থায়ী নহে, সহজেই বিবর্ণ হইয়া যায় অথবা জলে প্রক্ষালিত করা যায়। এইজন্য এই পুষ্পদ্বারা রঞ্জনের সময় লেবুর রস ও ফটকিরি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। রংবন্ধকারীর সাহায্যে এই রঙের স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায় বলিয়া মনে হয়।

(৪) **কুম্‌কুম্** (**Crocus sativus**)— কুম্‌কুম্ বহুকাল যাবৎ ভারতবর্ষে উৎসবাদিতে ও খাদ্যদ্রব্য রঞ্জিত করিতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ‘ভাবপ্রকাশ’ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কুম্‌কুম্‌কে হিন্দুস্থানে কেসর ও জাফরান, মহারাষ্ট্র ও গুর্জরে কেসর ও আরবীতে জাফ্‌রান বলা হয়। ইহার ইংরাজী নাম saffron। এখনও ইউরোপে উৎসবাদিতে saffron cake-এর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে কাশ্মীর প্রদেশে কুম্‌কুমের চাষ হয় এবং সেইজন্যই ইহার অন্য নাম ‘কাশ্মীর-জন্মা’। কুম্‌কুম্ পুষ্প শারদীয় ফুল এবং ইহা উজ্জ্বল পীতবর্ণ।

কুম্‌কুম্‌ পুষ্পের মধ্যস্থিত নলগুলির অগ্রভাগস্থিত লোহিত পিঙ্গলবর্ণ মণ্ডলাকার অংশই সর্বোৎকৃষ্ট কুম্‌কুম্‌ এবং ইহাই উচ্চমূল্যে 'সহি জাফরান' নামে বিক্রীত হয়। বাজারে যে জাফরান সাধারণত পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কুম্‌কুমের পাপড়ি কিংবা ফুলের নলের নিচের অংশ মিশ্রিত থাকে। এই নিকৃষ্ট জাফরানে সুগন্ধের অভাব থাকে এবং বর্ণের ঔজ্জ্বল্যও অনেক কম।

কুম্‌কুম্‌দ্বারা বস্ত্রাদি উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত করা যায়, কিন্তু অত্যধিক মূল্য বলিয়া ইহা সাধারণের পক্ষে ব্যবহার সম্ভবপর নহে। উত্তর ভারতে ধনিগণের মধ্যে উৎসবাদির সময় কুম্‌কুম্‌রঞ্জিত বস্ত্রাদির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে খাদ্যদ্রব্যাদি রঞ্জনের জন্য এবং সুগন্ধের জন্যই ইহা বিশেষভাবে আদৃত। পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে বহুপরিমাণ কুম্‌কুম্‌ ইউরোপে রপ্তানি করা হইত, কিন্তু ব্যবসায়িগণের অতিলোভে ভেজাল মিশ্রণের জন্য বর্তমানে এদেশীয় কুম্‌কুমের আদর নাই। বর্তমানে ইউরোপে কুম্‌কুমের রপ্তানি তো নাইই, পরন্তু ভারতে যে জাফরান বিক্রীত হয় তাহা কাশ্মীরী কুম্‌কুম্‌ নহে, তাহা সম্পূর্ণ বিদেশজাত। ১৯৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৯ লক্ষ টাকার এবং ১৯৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রায় ৭ লক্ষ টাকার কুম্‌কুম্‌ বিদেশ হইতে আমদানি হইয়াছিল।

(৫) **মান্দার ফুল (Erythrina indica)**— এই ফুলকে মান্দার, পলিতা মান্দার বলা হয়। শীতের শেষভাগে এই ফুল প্রস্ফুটিত হয়। মান্দার ফুল উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ এবং জল দিয়া উত্তপ্ত করিলে লোহিত বর্ণের জল পাওয়া যায় এবং বস্ত্রাদি ঐ জলে সিক্ত করিলে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হয়। বঙ্গদেশে ও আসামে অসংখ্য বন্য মান্দার বৃক্ষ জন্মে এবং এই বৃক্ষ কণ্টকাকীর্ণ থাকে বলিয়া জমির সীমানা নির্ধারণের জন্য এই বৃক্ষের প্রচুর ব্যবহার হয়।

(৬) **গাঁদা ফুল (Tagetas erecta)**— এই ফুলের জন্মস্থান আমেরিকা। আমেরিকা হইতে ইউরোপে ও ইউরোপ হইতে প্রায় দেড়

শতাধিক বৎসর পূর্বে এই ফুল ভারতবর্ষে আমদানি হয়, এবং এইজন্যই প্রাচীন কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে এই ফুলের উল্লেখ নাই। শীতের প্রথম হইতে বসন্তকাল পর্যন্ত এই ফুল প্রচুর পরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়। গাঁদা ফুল কিছুক্ষণ জল দিয়া উত্তপ্ত করিলেই, পীতবর্ণ জল পাওয়া যায় এবং বস্ত্রাদি পীতবর্ণে রঞ্জিত করা যায়। দরিদ্র শিল্পিগণ কুটীরশিল্প হিসাবে এখনও ইহা ব্যবহার করেন।

(৭) **ধাই ফুল (Woodfordia floribunda)**— ধাই বৃক্ষ গুল্মজাতীয়। উত্তরব্রহ্ম, শ্যামপ্রদেশ এবং আর্যাবর্তের প্রায় সর্বত্রই ইহা জন্মে। ধাই ফুল বসন্তকাল হইতে গ্রীষ্মের প্রথম পর্যন্ত প্রস্ফুটিত হয় এবং বঙ্গদেশ ব্যতিরেকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উদ্যানের শোভাবর্ধনের জন্য এই বৃক্ষ বহুলপরিমাণে রোপিত হয়। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে হিন্দুস্থানে 'ধাবোই', মহারাষ্ট্রে 'ধাইটী' এবং উৎকলে 'জাতিকো' বলা হয়। এই ফুল আয়ুর্বেদ মতে ঔষধ হিসাবেও ব্যবহার হয়।

রঞ্জন-কার্যের জন্য ধাই ফুলের ব্যবহার বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে এবং কয়েক বৎসর পূর্বেও ইহা রেশম রঞ্জিত করিতে ব্যবহৃত হইত। ফুটন্ত জলে পুষ্পগুলি উত্তপ্ত করিলেই পুষ্পের অভ্যন্তরস্থ রঞ্জক পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয় এবং সেই জলে রেশম, পশম ও কার্পাসবস্ত্র পীতবর্ণে রঞ্জিত করা যায়।

(৮) **তুণ ফুল (Cedrela toona)**— আসাম ও বঙ্গদেশ ব্যতিরেকে ভারতের সর্বত্র এই বৃক্ষ জন্মে এবং কাষ্ঠের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। তুন্নক, তুণীক, নন্দীবক্ষ, নন্দক প্রভৃতি এই বৃক্ষেরই নামান্তর। রঞ্জন-কার্যে এই পুষ্পের বিশেষ আদর ছিল না, তবে দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যেই গাঁদা ফুলের ন্যায় ইহার প্রচলন ছিল। অধুনা ইহার ব্যবহার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

জলে পুষ্পগুলি কিছুক্ষণ উত্তপ্ত করিলে ইহার রঞ্জক পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয় ও জল লোহিত-পীতবর্ণ হয় এবং বস্ত্রাদি ঐ জলে পীতবর্ণে রঞ্জিত করা যায়।

(৯) **পাটোয়া ফুল (Hibiscus sabdariffa)**— ইহা ভারতের উষ্ণ প্রদেশসমূহে এবং সিংহলে জন্মিয়া থাকে। পাটোয়া পুষ্প বর্ষাকালে প্রস্ফুটিত হয়। পূর্বভারতদ্বীপপুঞ্জজাত রোজেল বা red-sorrel ও পাটোয়া একই জিনিস। পাটোয়া পুষ্প পীতবর্ণ— রঞ্জন-কার্যের জন্য ইহার ব্যবহার ছোটনাগপুরে পার্বত্য অধিবাসিগণের মধ্যে এবং উত্তর ব্রহ্মে শানদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ফুলে রঞ্জক পদার্থের পরিমাণ অল্প এবং অন্যান্য সহজলভ্য পুষ্পজাত রঙের তুলনায় উক্ত পুষ্পজাত রঙ ম্লান ও হীনপ্রভ।

ইহা ছাড়া চীনদেশীয় পুষ্প 'চিঃ-চিয়া-হুয়া' উত্তর আরাকানে ও আসামের পার্বত্যজাতির স্ত্রীলোকদের মধ্যে হস্ত ও পদের নখ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত করিবার জন্য বহুদিন হইতেই ব্যবহৃত হইতেছে।

পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পুষ্পজাত রঙ অস্থায়ী, সূর্যালোকের সংস্পর্শে ম্লান হইয়া যায় এবং জল ও ক্ষারসংযোগে প্রক্ষালিত হয়। কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের আবিষ্কারের পর পুষ্পজাত রঞ্জক দ্রব্যের প্রচলন ক্রমশই হ্রাস পাইয়া লুপ্ত হইতেছে।

অন্যান্য উদ্ভিজ্জ রঙ

(১) **নীল**— অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে নীলের চাষ হইত এবং রঞ্জক দ্রব্য হিসাবে নীল পূর্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিল। ভারতবর্ষই নীলের জন্মস্থান এবং ভারতবর্ষ হইতে পারস্য, সিরিয়া, আরব ও মিশরে ইহার ব্যবসায় বিস্তৃতি লাভ করে। মিশরবাসিগণ প্রচুর পরিমাণে নীলের ব্যবহার করিত। প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বেকার শবাধারনিহিত শবের উপর নীলদ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। মিশর হইতে গ্রীসে এবং রোমে নীলের ব্যবহার প্রচারিত হয়, এবং প্লিনির বিবরণী হইতে জানা যায় যে, গ্রীক ও রোমের অধিবাসিগণ নীল রঙ্গকরূপে ব্যবহার করিতেন, ইহা দ্বারা রঞ্জন-প্রণালী তাঁহারা অবগত ছিলেন না। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী ও জার্মানদেশে

ইহা আনীত হয়, কিন্তু তখন নীলের উপর অনেকেই বীতরাগ ছিলেন এবং অনেকের ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, ইহা অত্যধিক বিষাক্ত এবং ইহার ব্যবহার আইনপ্রয়োগে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কারের পর নীল ইউরোপে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইতে লাগিল। ইউরোপে ওড্ (woad) নামক বৃক্ষ হইতে নীল রঙ পাওয়া যাইত। কিন্তু উহাতে রঞ্জন-দ্রব্যের পরিমাণ অল্প বলিয়া নীলই অধিক সমাদৃত।

নীলের জন্য ইণ্ডিগোফেরা (indigofera) জাতীয় অনেক রকম বৃক্ষের চাষ প্রচলন হইয়াছে এবং ভারত, চীন, জাপান, জাভা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আমেরিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্, ব্রেজিল, মাদাগাস্কার এবং দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার স্থানে স্থানে নীলবৃক্ষের চাষ ছিল, তবে নীলের আদিস্থান ভারতবর্ষ নীলচাষের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ পূর্বেকার নীলচাষের স্মৃতি জাগরূক করিয়া দেয়। কৃত্রিম নীল প্রচলনের পরেই নীলচাষ ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রায় ১৭ লক্ষ একর জমি চাষ করিয়া ২ লক্ষ ৩৭ হাজার হন্দর নীল পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু কৃত্রিম নীল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৪-৫ খ্রীস্টাব্দে ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে নীল চাষ হইয়া মাত্র ৫৬ হাজার হন্দর নীল প্রস্তুত হইয়াছিল।

নীল হইতে সর্বপ্রথমে অ্যানিলিন পাওয়া যায় এবং সেইজন্যই অ্যানিলিন নামের উৎপত্তি।

রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে নীলবৃক্ষের রঞ্জক পদার্থের মূলীভূত বস্তু ইণ্ডিক্যান (indican)। এই ইণ্ডিক্যানের অণু বৃক্ষস্থ এন্‌জাইম(enzyme)এর ক্রিয়ায় ভাঙিয়া ইণ্ডক্সিল(indoxyl)এ পরিণত হয় এবং শেষোক্ত ইণ্ডক্সিল বাতাসের অক্সিজেনযোগে নীলরঙের সৃষ্টি করে। সুতরাং নীল প্রস্তুতের জন্য মূলত দুইটি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন।—

(ক) নীলবৃক্ষ জলে সিক্ত করা, যাহাতে এন্‌জাইমের দ্বারা ইণ্ডিক্যান হইতে ইণ্ডক্সিল পাওয়া যায়।

জমি হইতে সদ্য সংগৃহীত কতকগুলি নীলবৃক্ষ পুঞ্জীভূত করিয়া একসঙ্গে বাঁধিয়া জলের চৌবাচ্ছার মধ্যে ৯ হইতে ১৫ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখা হয়। ২।৩ ঘণ্টা পরেই fermentation বা পচনের জন্য গ্যাসের বুদ্‌বুদ নির্গত হইতে থাকে— এই গ্যাসের মধ্যে নাইট্রোজেন থাকে, কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে এবং শেষের দিকে হাইড্রোজেন ও মার্শগ্যাসও বহুলপরিমাণে পাওয়া যায়। যখন বুদ্‌বুদ্ আর দেখা যায় না তখন বুঝিতে হইবে পচন শেষ হইয়াছে।

(খ) ইণ্ডক্সিল হইতে বাতাসের অক্সিজেনযোগে নীল রঙ প্রস্তুত করা।

প্রথম প্রণালীর পরেই বৃক্ষের নির্যাস অন্য চৌবাচ্ছায় স্থানান্তরিত করিয়া বাতাসের সংস্পর্শে চাকার দ্বারা কিংবা অন্যপ্রকারে ভীষণভাবে আলোড়িত করিতে হয়। প্রায় ২।৩ ঘণ্টা পরে নির্যাসের নানারকম বর্ণের পরিবর্তন হয়— ম্লান হরিৎ গাঢ় নীল রঙে পরিণত হয় এবং পরে নীল জলের নিচে অধঃক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া যায় এবং উপরের জলের রঙ ম্লান পীতবর্ণ ধারণ করে।

উক্ত রঞ্জক জল হইতে পৃথক করিয়া শুষ্ক করিয়া বাজারে পণ্য হিসাবে বিক্রীত হয়।

(২) **মঞ্জিষ্ঠা (Madder)**—কার্পাসবস্ত্র স্থায়ী গাঢ় রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিবার জন্য মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে তুর্কী এবং গ্রীসদেশে মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার প্রচলিত হয় এবং উক্ত দেশে ইহার বহুল ব্যবহারের জন্য মঞ্জিষ্ঠা রঙের নামান্তর ‘টার্কি রেড’ (Turkey red)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই রঙের ব্যবহার ফ্রান্সে ও পরে ইংলণ্ডে আরম্ভ হইয়াছে।

‘রুবিয়া’ জাতীয় গুল্মের মূল হইতে এই রঞ্জক পদার্থ সংগৃহীত হয়। পুরাতন মূলে রঞ্জক অধিক পরিমাণে থাকে এবং সেইজন্য ২।৩ বৎসরের পুরাতন গুল্মই বেশি ব্যবহার করা হয়। মূলগুলি জলে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া চূর্ণ করিয়া রাখা হয়। রাগবন্ধকের সাহায্যে নানা আভার পাকা রঙ পাওয়া

যায় বলিয়া ইহা সর্বোৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক রঞ্জক বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ফটকিরি এবং লৌহ রাগবন্ধকের সাহায্যে নয়নাভিরাম নীলাভ অলক্তক রঙের জন্য ইহা বিশেষ খ্যাত। মঞ্জিষ্ঠার রঞ্জক পদার্থের নাম 'অ্যালিজারিন' ও 'পার্‌পিউরিন', তবে 'রুবিয়া টিন্‌কৃটোরিয়াম'-এর মূলে অ্যালিজারিনের পরিমাণ বেশি, কিন্তু 'রুবিয়া কর্ডিফোলিয়া'র মূলে প্রধানত পার্‌পিউরিনই পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে চে-মূল (chay root) ও অলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। চে-মূলকে বঙ্গদেশে 'তুর্‌বুলি', তেলেগুতে 'চেরী-ভেলো' বলা হয়। ইহা সমুদ্রতীরে জন্মায় এবং সেইজন্যই ইহা প্রচুর পরিমাণে মাদ্রাজ প্রদেশে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে ইহা রঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত না হইলেও মালাবার এবং করমণ্ডলে ইহা পূর্বে বহুলপরিমাণে চাষ করা হইত এবং মঞ্জিষ্ঠার ন্যায়ই ইহা রঞ্জক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

অলের মূল (morinda root) 'সুরঞ্জী' নামে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। ইহা ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে বনে জঙ্গলে ইহা জন্মায়, রঞ্জন-শিল্পিগণ নিজ নিজ গ্রামে অল্পপরিমাণে চাষও করিয়া থাকে— বৃক্ষের বীজ কিংবা ডাল হইতে সহজেই ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সাধারণত ২।৩ বৎসর পরেই মাটির তলা হইতে ৩।৪ ফুট পর্যন্ত ইহার মূল উঠাইয়া লইয়া মূলের বল্কল হইতে এই রঙ সংগৃহীত হয়—গাছ অধিক বড় হইলে মূলে রঞ্জক দ্রব্যের মাত্রা বিশেষ কমিয়া যায়। রক্তবর্ণ, রক্তাভ বেগুনীবর্ণ কিংবা অলক্তকবর্ণে কার্পাসবস্ত্রের পাড় রঞ্জিত করিতে অথবা এণ্ডি-কাপড়ের পাড় রঞ্জিত করিতে, শিল্পিগণ ইহা ব্যবহার করেন।

মঞ্জিষ্ঠা, চে-মূল ও অলের মূলীভূত রঞ্জক পদার্থের রাসায়নিক স্বরূপ প্রায় একইরকম এবং এইগুলি একই প্রণালীতে রঞ্জন-শিল্পে ব্যবহৃত হইত।

(৩) **হরিদ্রা (Turmeric)**— হরিদ্রা curcuma-জাতীয় বৃক্ষের মূল।

ইহার মূলীভূত রঞ্জক পদার্থ 'কার্‌কিউমিন' (curcumin)। নিরপেক্ষভাবে কিংবা রাগবন্ধকের সাহায্যে হরিদ্রার দ্বারা পাকা রঙে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা যায়। হরিদ্রার চূর্ণ ফুটন্তজলে দ্রবীভূত করিয়া সেই দ্রবণে রেশম ও সিল্ক, সিক্ত করিলেই রঞ্জিত হয়, কার্পাসবস্ত্রের রঞ্জনের সময় সামান্য অ্যাসেটিক অম্ল কিংবা ফটকিরি মিশ্রিত করার প্রথা চলিত আছে।

জান্তব রঞ্জক

(১) **প্রাচীনগণের রক্তাভ বেগুনী রঙ** (**Tyrian purple** বা the purple of the ancients)— খ্রীস্টজন্মের প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব হইতে এই রঞ্জক পদার্থ ব্যবহৃত হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফিনিসীয়গণ 'মিউরেক্স ব্র্যাণ্ডারিস' নামক এক জাতীয় সমুদ্রজাত শম্বুক হইতে ইহা প্রস্তুত করিত এবং টিয়ার নামক বন্দরে ইহা প্রস্তুত হইত বলিয়াই ইহা 'টিরিয়ান পার্পল' বলিয়া অভিহিত হয়। ইহার নামকরণ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। 'টিরস' নামক জলদেবী একদিন তাঁহার প্রেমিকের সহিত সমুদ্রতীরে বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার অনুগামী কুকুরটি বালুকার উপরে একটি শম্বুক দেখিতে পাইয়া দন্তদ্বারা উহা চূর্ণ করে এবং শম্বুকস্থ রক্তাভ বেগুনী রঙে কুকুরটির মুখ রঞ্জিত হইয়া যায়। টিরস উক্ত রঙ দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া প্রেমিককে ঐ রঙে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিতে অনুরোধ করেন— অবশ্য প্রেমিকার অনুরোধ রক্ষিতও হইয়াছিল। জলদেবীর নামানুসারে এই রঙের নাম 'টিরিয়ান পার্পল'।

এই রঙ অতি দুর্মূল্য সামগ্রী এবং ইহা সম্রাটগণের বেশভূষার জন্য ব্যবহৃত হইত ও ধর্মকার্যের অঙ্গীভূত ছিল। রোমের সম্রাটগণের বেশ ইহাদ্বারা রঞ্জিত হইত এবং উচ্চপদস্থ কাহাকেও সংবর্ধনা করিতে হইলে সম্রাটগণ এই রঙে রঞ্জিত বেশ উপহার প্রদান করিতেন— এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ফিনিসীয়গণের বুদ্ধিকৌশলে অন্যান্য শামুকের অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যের মিশ্রণে ও

SENIOR BASIC

বস্ত্ররঞ্জনের প্রণালীর বিভিন্নতায় নানাজাতীয় রঙের সৃষ্টি হইত। ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম কোলের লিখিত বিবরণী হইতে উক্ত রঙের প্রয়োগপ্রণালী কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়। কোলে লিখিয়াছেন, '১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে আমি পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম যে, আয়র্লণ্ডের কোনও বন্দরে একজন শিল্পী নানা স্থান হইতে প্রেরিত বস্ত্রের উপর প্রেরকের নির্দেশমত নাম অথবা চিত্রাদি লোহিতবর্ণে চিত্রিত করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জন করেন এবং লোহিত রঙ শম্বুকের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ হইতে সংগৃহীত হয়।' বহু অনুসন্ধানের পর কোলে ব্রিস্টল চ্যানেলের তীরে একজাতীয় শম্বুকের সন্ধান পাইলেন এবং দেখিলেন যে, ইহার অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ রৌদ্রের সংস্পর্শে রঞ্জন-পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারে। কোলে বলেন, 'কোনও সূচ্যগ্র পেন্সিল দিয়া এই তরল পদার্থে বস্ত্রাদির উপর যাহা লিখিত বা অঙ্কিত হয়, তাহা অনতিবিলম্বেই হরিতাভ হইয়া যায় এবং রৌদ্রের সংস্পর্শে ইহা নানাবর্ণে পরিণত হয়, প্রথমে গাঢ় হরিৎ, পরে নীল এবং পরে রক্তাভ বেগুনী প্রভৃতি বর্ণবিপর্যয় ঘটে। রৌদ্রের প্রখরতার উপর বর্ণ বৈষম্য নির্ভর করে, তবে সর্বশেষে অলক্তক বর্ণই স্থায়ী হয় এবং বহুবার প্রক্ষালিত হইলেও এই রঙ ম্লান বা হীনপ্রভ হয় না।' ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কোলে রয়াল সোসাইটির তদানান্তন অন্যতম সম্পাদক ডক্টর প্লটকে এই রঙে রঞ্জিত এক খণ্ড বস্ত্র নমুনাস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন এবং কোলে রয়াল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় চার্লসের সম্মুখে উক্ত তরল পদার্থ হইতে বস্ত্র রঞ্জিত করিবার প্রণালী স্বহস্তে প্রদর্শন করিবেন এই অভিপ্রায়ে ব্রিস্টল হইতে জীবন্ত শম্বুক জাহাজে করিয়া আনিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাজার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই।

(২) **পিউরী** বা **গোরোচনা**— পিউরী ভারতবর্ষে প্রস্তুত এবং 'ভারতীয় লোহিত' বলিয়া অভিহিত। দরজা-জানালার রঙ্গকভাবেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়, দুর্গন্ধের জন্য রঞ্জন-দ্রব্য হিসাবে ইহা আদৃত হয় না।

পূর্বে মুঙ্গেরে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। গরুকে আমের পাতা খাওয়াইলে সেই গরুর মূত্র হইতে এই রঙ পাওয়া যায়। উক্ত গোমূত্র রৌদ্রে কিংবা কাঠকয়লার চুল্লিতে শুষ্ক করিলে পিউরী রঙ্গক পাওয়া যায়। ছোট ছোট বলের আকৃতি করিয়া ইহা দুই টাকা সের দরে বিক্রীত হইত। একটি গরু হইতে অনধিক আধ পোয়া রঙ্গক পাওয়া যাইতে পারে। পূর্বে ভারতবর্ষে এইভাবে ১০০ হইতে ১৫০ হন্দর রঙ্গক প্রস্তুত হইত। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, পিউরী রঙ্গকের প্রধান উপাদান ইউজ্যান্‌থিক অম্লের (euxanthic acid) ম্যাগনেসিয়াম কিংবা ক্যাল্‌সিয়াম-ঘটিত লবণ। হাইড্রোক্লোরিক অম্লের ক্রিয়ায় ইউজ্যান্‌থিক অম্ল হইতে ইউজ্যান্‌থোন (euxanthone) পাওয়া যায়। ইউজ্যান্‌থোন খরগোশ ও কুকুরকে খাওয়াইবার পর দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের মূত্র হইতেও ইউজ্যান্‌থিক অম্ল পাওয়া যায়।

রাসায়নিক গ্রাবে সর্বোৎকৃষ্ট পিউরীর উপাদান নিম্নোক্তরূপ প্রমাণ করিয়াছেন ঃ

ইউজ্যান্‌থিক অম্ল	শতকরা	৫১'০	ভাগ
সিলিসিক অম্ল এবং অ্যালুমিনা	"	১'৫	"
ম্যাগ্‌নেসিয়াম	"	৪'২	"
ক্যাল্‌সিয়াম	"	৩'৪	"
জল এবং অন্যান্য উদ্‌বায়ী বস্তু	"	৩৯'০	"

(৩) **কোচিনীল** বা **ইন্দ্রগোপ**— বহুদিন হইতে আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে কোচিনীল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইউরোপীয়গণ আমেরিকা আবিষ্কারের পরে কোচিনীল আমদানি করেন, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতেই কোচিনীলের ব্যবহার চলিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ 'রসার্ণব' ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ 'রত্নসমুচ্চয়ে' 'ইন্দ্রগোপ' বা 'ইন্দ্রগোপক' নামে কোচিনীলের উল্লেখ আছে।

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE
~~12098~~ 6796

'ককাস্ ক্যাক্টাই'* নামক একপ্রকার পোকার শুষ্ক শরীর হইতে কোচিনীল পাওয়া যায়। বন্য ক্যাক্টাস্ বৃক্ষে এই পোকা জন্মে এবং এই পোকার জন্যই এই বৃক্ষের প্রভূত পরিমাণে চাষ হইত। বর্ষার প্রারম্ভে এই পোকাগুলি সংগৃহীত করিয়া ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া দিলেই পোকাগুলি মরিয়া যায় এবং তাহাদের মৃতদেহ হইতে এই রঞ্জক পাওয়া যায়। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে স্পেনদেশে ও জাভায় কোচিনীলের জন্য বৃক্ষের চাষ আরম্ভ হয়। কৃত্রিম রঞ্জক দ্রব্যের প্রচলনের পরে এই বৃক্ষের চাষ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, কোচিনীলের মূলীভূত রঞ্জক পদার্থ কার্‌মাইনিক অম্ল (carminic acid)।

কোচিনীলের দ্বারা রেশম ও সিল্কই রঞ্জিত করা হইত, অ্যালুমিনিয়াম সাল্‌ফেট কিংবা স্ট্যানাস ক্লোরাইডের সংযোগে ইহা দ্বারা বস্ত্র চমৎকার অলক্তক রঙে রঞ্জিত করা যায়— এই রঙ আলোর সংস্পর্শে স্থায়ী হইলেও মৃদু ক্ষারের সংস্পর্শে ম্লান হইয়া যায়।

২

কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের প্রচলন

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের বিখ্যাত রাসায়নিক উইলিয়ম হেন্‌রী পার্কিন (William Henry Perkin) রসশালায় কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার সময়ে একটি পরীক্ষার ফলে কৃত্রিম বেগুনী রঙ পাইলেন এবং তিনি এই রঙের নাম দিলেন অ্যানিলিন মভ (aniline mauve)। অ্যানিলিন নামক রাসায়নিক পদার্থ হইতে অক্সিজেনযোগে সহজেই এই রঙের সৃষ্টি হয়। এই আবিষ্কারের ফলে রঞ্জন-পদার্থের ইতিহাসে নবযুগের প্রবর্তন হয় এবং তৎকালীন বিশিষ্ট রাসায়নিকগণের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী রাসায়নিক ভার্‌গুইন (Verguin) এই অ্যানিলিন হইতেই 'ম্যাজেণ্টা' (magenta) প্রস্তুত করেন। যেদিন ভার্‌গুইন ম্যাজেণ্টা রঙ রসশালায় প্রস্তুত করেন, সেইদিন ফরাসী এবং অষ্ট্রিয়দের ম্যাজেণ্টা নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল এবং সেই দিবসের স্মৃতিস্বরূপ এই নামকরণ।

ইংলণ্ডে পার্কিন ও তাঁহার শিষ্যবর্গ এবং ফরাসীদেশে ভার্‌গুইন ও তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী অ্যানিলিন হইতে বেগুনী রঙ প্রস্তুত করিয়া অল্পব্যয়ে সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্যার বিষয় দাঁড়াইল অ্যানিলিন। অ্যানিলিন অল্পব্যয়ে এবং সহজে প্রস্তুত করিতে হইলে চাই বেন্‌জিন (benzene)। বিখ্যাত রাসায়নিক হফ্‌ম্যান এবং ম্যান্‌স্‌ফিল্ড (Hofmann and Mansfield) আলকাতরা হইতে অনায়াসেই বেন্‌জিন পাইবার সহজ উপায় নির্দেশ করিয়া দিলেন। প্রকৃতপক্ষে শেষোক্ত রাসায়নিক-দ্বয়ের আবিষ্কারের গুরুত্ব কোনও অংশেই কম নহে। আজ বিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যত রকম কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ আবিষ্কৃত ও সচরাচর

ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে আলকাতরার নিতান্ত প্রয়োজন এবং সেইজন্য কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থকে সাধারণত আলকাতরা হইতে উদ্ভুত রঞ্জক পদার্থ বলা হয়।

পূর্বে আলকাতরার মোটেই সমাদর ছিল না—কালো রঙের জন্য কিংবা জ্বালানিভাবে ইহার প্রচলন থাকিলেও, সাধারণে ইহাকে আবর্জনার মতই মনে করিত। কবি কালো রঙের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তখনও তিনি আলকাতরার গুণাবলী জানিতেন না— নিতান্তই উপেক্ষিত, কুৎসিত আলকাতরারও গুণ অশেষ, সত্য কথা বলিতে গেলে আলকাতরা রত্নগর্ভা—কত হাজার রকম জিনিস যে আলকাতরা হইতে প্রস্তুত করা যায়, তাহা একশত বৎসর পূর্বে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

বাতাসের সংস্পর্শ না রাখিয়া যদি কয়লাকে তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে গ্যাসীয় পদার্থের সহিত আলকাতরার সৃষ্টি হয়। এই পাতন-প্রণালীর নাম 'অন্তর্ধূম পাতন'। এইভাবে কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিয়া বড় বড় শহরে সেই গ্যাস জ্বালানো হয়— রন্ধনের জন্য, আলো জ্বালাইবার জন্য কিংবা কারখানায় কোনও জিনিস উত্তপ্ত করিবার জন্য— যেহেতু গ্যাসের অগ্নিশিখা নির্ধূম। গ্যাসের সঙ্গে চট্‌চটে কালো যে আলকাতরা পাওয়া যায়, তাহা আবার তপ্ত করিয়া পাতিত করিলে পৃথক্ পৃথক্ তৈলজাতীয় জিনিস পাওয়া যায়, এই পাতন-প্রণালীকে বলে— আংশিক পাতন। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকেই বলা হয় পিচ (pitch)। এই পিচই পাকা রাস্তা তৈয়ারি করিবার সময় দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত অংশগুলি পাওয়া যায় :

প্রথমাংশ, ১৭০° পর্যন্ত, হাল্কা তৈল (Light oil কিংবা naphtha)	আলকাতরার শতকরা ৪ ভাগ
দ্বিতীয়াংশ, ২৩০° পর্যন্ত, মধ্যমাংশের তৈল (Middle oil কিংবা carbolic oil)	„ „ ৯ „

তৃতীয়াংশ, ২৭০° পর্যন্ত, ভারী তৈল (Heavy oil কিংবা creosote oil)	আলকাতরার শতকরা ৯ ভাগ
চতুর্থাংশ, ৪০০° পর্যন্ত, সবুজ তৈল (Anthracene oil)	" " ১০ "

এই সমস্ত তৈল-পদার্থ হইতে বিভিন্ন রকমের যৌগিক পদার্থ পুনরায় আংশিক পাতন-প্রণালীদ্বারা পৃথক্ করা সম্ভবপর। এই জিনিসগুলিই প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিকের হাতে অপরূপ সামগ্রী— এইগুলিকেই মূল ভিত্তি করিয়া রাসায়নিক রসশালায় তাঁহার উদ্ভাবনীশক্তির সাহায্যে এবং পরীক্ষা-কৌশলে বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারের সৃষ্টি করিয়াছেন। আলকাতরা হইতে উদ্ভূত এই পদার্থগুলিই সৃষ্টি করিয়াছে শতসহস্র কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ, কৃত্রিম প্রসাধন-সামগ্রী, কৃত্রিম খাদ্যসম্ভার, নানাপ্রকার ঔষধ ও বর্তমান মহাসমরের মারণাস্ত্র বিষাক্ত গ্যাস ও বিস্ফোরক পদার্থ।

প্রথমাংশ হাল্কা তৈল হইতে পাওয়া যায় সাদা কেরোসিন কিংবা পেট্রোলের ন্যায় বেন্‌জিন্ (benzene), টলুইন (toluene), জাইলিন (xylene) প্রভৃতি। দ্বিতীয়াংশ ও তৃতীয়াংশ হইতে শঙ্খধবল ন্যাপ্‌থ্যালিন ও কার্বলিক অম্ল (carbolic acid) পাওয়া যায় এবং চতুর্থাংশ হইতে অ্যান্‌থ্রাসিন (anthracene) পাওয়া যায়। কুচ্‌কুচে কালো পাথুরে কয়লা হইতে এইগুলি সংগ্রহ করার নব নব উপায় উদ্ভাবন করিয়া বিজ্ঞানী তাঁহার বিচিত্র পরীক্ষাকৌশলের পরিচয় দিয়া বিশ্বের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন।

সাধারণত ১ টন কয়লা হইতে ১০ হইতে ২০ গ্যালন আলকাতরা পাওয়া যায়। ১০০ ভাগ আলকাতরা হইতে পাওয়া যায়:

বেন্‌জিন, টলুইন, জাইলিন প্রভৃতি	১·৪০ ভাগ
কার্বলিক অম্ল	·২০ "
ন্যাপ্‌থ্যালিন	৪·০০ "
ক্রিয়োসোট তৈল	২৪·০০ "

অ্যান্‌থ্রাসিন	·২০	„
পিচ্‌	৫৫·০০	„
জল	১৫·০০	„

এই সময়ে প্রখ্যাতনামা রাসায়নিক কেকুলে (Kekule) বেন্‌জিনের রাসায়নিক আকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটি নকশার উদ্ভাবন করিলেন। বেন্‌জিন অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের যৌগিক পদার্থ, একটি বেন্‌জিনের অণুর মধ্যে ৬টি অঙ্গার ও ৬টি হাইড্রোজেনের পরমাণু আবদ্ধ আছে ($C_6 H_6$)। এই পরমাণুগুলির সন্নিবেশ বলয়াকৃতির ন্যায় (ring structure)। প্রত্যেকটি অঙ্গারের পরমাণু এমনই ভাবে যুক্ত আছে যে, সহজে সেই যোগসূত্র ছিন্ন করা সম্ভবপর নহে। প্রত্যেকটি অঙ্গারের পরমাণুর সহিত এক-একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু আবদ্ধ আছে এবং এই হাইড্রোজেনের পরমাণুকে সহজেই বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণু সেই স্থানে সন্নিবেশ করা যায়—হাইড্রোজেনগুলি যেন বলয়ে মণিমুক্তার মত। কেকুলের প্রধান প্রতিপাদ্য এই যে, বেন্‌জিনের অঙ্গার-পরমাণুগুলি এমনই আলিঙ্গনে আবদ্ধ যে সেই অণু খুবই সুদৃঢ়। বেন্‌জিন হইতে যে সব যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট হইবে, তাহাতেও অনুরূপ বলয় আকৃতি থাকিবে, তবে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে অন্য পরমাণু কিংবা পরমাণুপুঞ্জ সন্নিবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি হইতে পারে।

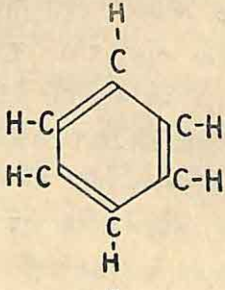

বেন্‌জিন

বেন্‌জিনের এই অপরূপ রাসায়নিক মূর্তির কল্পনা করিয়া কেকুলে রসায়ন-জগতে এক নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করিলেন— রাসায়নিকগণের মধ্যে নূতন প্রেরণার সৃষ্টি হইল। সকলেই ঐক্যবদ্ধ হইয়া এই আকৃতির স্বপক্ষে প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইলেন। যুগপ্রবর্তক ঋষি কেকুলের বেন্‌জিনের অভিনব রাসায়নিক মূর্তি স্বীকার করিয়া রাসায়নিকগণ নূতন চিন্তাধারায় কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বে যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে তাঁহারা একান্তই তিমিরে ছিলেন, সেই সব যৌগিক পদার্থের আকৃতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল এবং পার্কিন ও ভার্‌গুইনের আবিষ্কৃত কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের পরমাণুসন্নিবেশ তাঁহাদের মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে কেকুলের বেন্‌জিনের আকৃতিকে ভিত্তি করিয়া অসংখ্য যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট হইল এবং রাসায়নিকগণ তাঁহাদের পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

কালক্রমে প্রমাণিত হইল যে, যৌগিক পদার্থের মধ্যে এইরূপ বলয়াকৃতি মোটেই অসাধারণ নহে, অঙ্গারের পরমাণু দুই বা তিন বা ততোধিক বলয় নির্মাণ করিয়া সুখে বসবাস করিতে পারে এবং মাঝে মাঝে এই বলয়ের মধ্যে একটি, দুইটি বা তিনটি নাইট্রোজেন কিংবা গন্ধক কিংবা অক্সিজেনের পরমাণুকেও আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে পারে। অব্যর্থ প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, নিম্নলিখিত পদার্থগুলির পরমাণু-সন্নিবেশ এইরূপ :

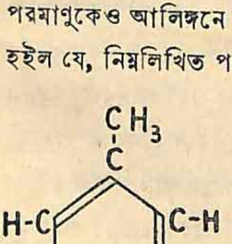

টলুইন

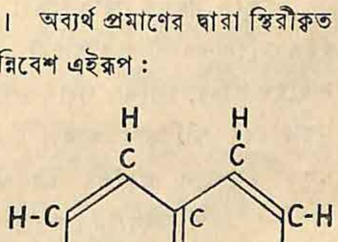

ন্যাপ্‌থ্যালিন

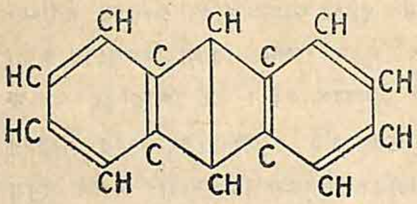
CH
CH
CH
HC
C
C
CH
HC
CH
C
C
CH
CH
CH

অ্যান্থ্র্যাসিন

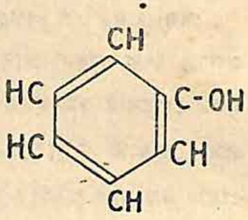
CH
HC
C-OH
HC
CH
CH

কার্বলিক অম্ল

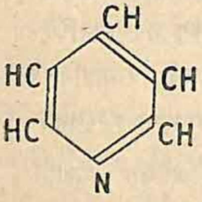
CH
HC
CH
HC
CH
N

পিরিডিন

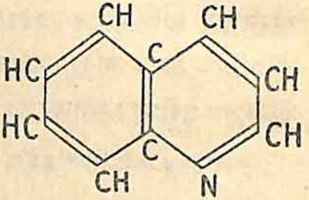
CH
CH
C
HC
CH
HC
CH
C
CH
N

কুইনোলিন

এইগুলি সমস্তই আলকাতরা হইতে পাওয়া যায়। স্পষ্টই প্রতিভাত হইল যে, সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতিদেবী নিপুণা শিল্পীর ন্যায় আলপনার মত পরমাণুগুলি সন্নিবেশ করিয়া যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। দেশ-পর্যটক যেমন নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছেন, রাসায়নিকও সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির এই প্রহেলিকাময় নূতন সাম্রাজ্যের সন্ধান করিয়া প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং রসশালায় ঐরূপভাবে পরমাণু-সন্নিবেশে সহস্র সহস্র যৌগিক পদার্থের জন্মদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই ভাবে এমন অনেক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা প্রকৃতির সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে এখনও পাওয়া যায় নাই, অথচ বিশ্বের কল্যাণের জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

কৃত্রিম রঙসমূহের আবিষ্কারের পরেই ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে হফ্‌ম্যান আনন্দে স্ফীতবক্ষ হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'এখন হইতে আর প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা রঞ্জন-উপকরণ সংগ্রহের জন্য বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে না। পক্ষান্তরে অল্পদিনের মধ্যেই ইংলণ্ড রঙ প্রস্তুত ব্যাপারে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবে এবং ইংলণ্ডে প্রস্তুত কৃত্রিম রঙসমূহ অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইবে; হয়তো অদূর ভবিষ্যতে নীলের আদিস্থান ভারতবর্ষে কৃত্রিম নীল, কোচিনীলের কেন্দ্রস্থান মেক্সিকোতে কৃত্রিম লাল রঙ বা কুসুমফুলের দেশ জাপানে চীনে কৃত্রিম পীত রঙ এবং সম্প্রতি অন্যান্য যে দেশ হইতে যে রঙ আমদানি হইয়া থাকে, সেই দেশে তদনুরূপ কৃত্রিম রঙসমূহ পণ্যরূপে ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইবে।' হফ্‌ম্যানের দাম্ভিকতাপূর্ণ ভবিষ্যৎবাণী যে সত্য হইয়াছে, ইহা যে-কোনও রঞ্জন-শিল্পী স্বীকার করিবেন। উদ্ভিজ্জ ও পুষ্পজাত রঞ্জক দ্রব্যের আবাসভূমি ভারতবর্ষ অধুনা বিদেশজাত রঞ্জকের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। খাদ্যদ্রব্যের জন্য, বস্ত্রাদির জন্য, এমন-কি উৎসবাদির জন্য যে রঙ প্রয়োজন তাহা সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানি হয়; বর্তমান মহাসমরে আমরা এই পরমুখাপেক্ষিতার ফল মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। ১৯৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার, ১৯৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রায় পৌনে তিন কোটি টাকার একমাত্র আলকাতরা হইতে উদ্ভূত কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে।

কৃত্রিম রঞ্জন-পদার্থের ইতিহাসে ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ স্মরণীয় যুগ। এই সময়ে রাসায়নিকগণের প্রচেষ্টায় বহু কৃত্রিম রঙের আবিষ্কার হয়। ম্যাজেণ্টা এবং অ্যানিলিন হইতে গিরার্ড (Girard) এবং ডি লেয়ার (de Laire) প্রথম কৃত্রিম নীল রঙ রোজ্যানিলিন ব্লু (rosaniline blue) প্রস্তুত করিলেন এবং তাঁহাদের প্রস্তুতপ্রণালীর সন্ধান পাইয়া হফ্‌ম্যান উহার পরমাণুর সামান্য ব্যতিক্রম করিয়া কৃত্রিম বেগুনী রঙ 'হফ্‌ম্যান ভায়োলেট' প্রস্তুত করিলেন। এই সময়েই লথ্‌ (Lauth) কৃত্রিম বেগুনী রঙ 'মিথাইল

ভায়োলেট', লাইট্ফুট (Lightfoot) কৃত্রিম মূল্যবান কালো রঙ 'অ্যানিলিন ব্ল্যাক', নিকল্সন (Nicholson) কৃত্রিম কমলা রঙ 'ফস্ফিন', চের্পিন (Cherpin) প্রথম কৃত্রিম সবুজ রঙ 'অ্যাল্ডিহাইড গ্রীন', কুপিয়ার (Coupier) 'ইণ্ডুলিন' আবিষ্কার করেন। এই সময়ে আবিষ্কৃত অন্যান্য কৃত্রিম রঙের মধ্যে 'বিস্মার্ক ব্রাউন' নামক বাদামী রঙ, 'মার্টিয়াস ইয়েলো' নামক পীত রঙ, 'পেলাটিন অরেঞ্জ' নানক নারাঙ্গী রঙ এবং 'ম্যাগ্ডালা রেড' নামক লোহিত রঙ উল্লেখযোগ্য।

এই যুগের পরেই রাসায়নিকগণের শতমুখী প্রতিভার স্ফুরণ দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রকৃতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পণ্ডিতগণ স্বভাবজাত রঞ্জন-দ্রব্যের সৃষ্টি জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তখন মঞ্জিষ্ঠাজাতীয় উদ্ভিদের রঞ্জক পদার্থের অশেষ খ্যাতি ছিল— এই রঞ্জক পদার্থকে অ্যালিজারিন (alizarin) নামে অভিহিত করা হয়। ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইটালী ও তুরস্ক দেশে এই উদ্ভিদের যথেষ্ট চাষ হইত। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে জার্মান রাসায়ানিকদ্বয় গ্রাব ও লিবের্ম্যান (Graebe and Libermann) মৌলিক গবেষণার ফলে রসশালায় অ্যালিজারিনের সংশ্লেষণ করিয়া বিশ্ববিশ্রুত হন।

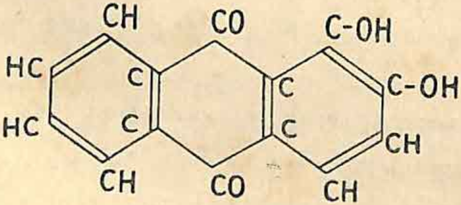

অ্যালিজারিন

অ্যালিজারিন প্রস্তুত করিবার জন্য আলকাতরা হইতে উদ্ভূত অ্যান্থ্র্যাসিনের প্রয়োজন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে জার্মানির বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অ্যাডল্ফ্ ফন্ বায়ার (Adolf von Baeyer) রসশালায় নীলের রঞ্জক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া

রাসায়নিকের পরীক্ষা-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। রাসায়নিকের কৃতিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ পাইয়া পাশ্চাত্য দেশের ধনী ব্যবসায়িগণ গবেষণার জন্য মুক্তহস্তে অর্থদান করিলেন এবং ব্যবসায়িগণের নিকট উৎসাহ ও আনুকূল্য পাইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলী কৃত্রিম নীল অল্পব্যয়ে প্রস্তুত করিবার সহজ উপায় নির্ধারণে মনোনিবেশ করিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অনুসন্ধানের ফলে বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া কৃত্রিম নীল প্রস্তুতের অল্পব্যয়সাধ্য প্রণালী আবিষ্কৃত হইল; এবং ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ব্যাডিসে অ্যানিলিন উণ্ড সোডা ফ্যাব্রিক কোম্পানি (Badische Aniline und Soda Fabrik) কৃত্রিম নীল ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ফলে স্বভাবজ নীল বাজার হইতে অন্তর্হিত হইল। নীলের চাষ একেবারে লোপ পাইল। ব্যাডিসে কোম্পানি কৃত্রিম নীল প্রস্তুতের গবেষণার জন্যই ৯ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। প্রচুর পরিমাণে নীল প্রস্তুত করিবার গবেষণার সময় একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ন্যাপ্‌থ্যালিন হইতে থ্যালিক অম্ল (phthalic acid) প্রস্তুত করিবার একটি পরীক্ষার সময়, থার্মোমিটারটি ভাঙিয়া যায় এবং থার্মোমিটারের অভ্যন্তরস্থ পারদ পাত্রস্থ দ্রব্যাদির মধ্যে মিশ্রিত হইয়া সহজেই থ্যালিক অম্লের সৃষ্টি করে এবং পরে দেখা যায়, পারদ এই রাসায়নিক ক্রিয়ার অনুকূল। এই আকস্মিক ঘটনা রাসায়নিকগণের পরিশ্রমের লাঘব করিয়াছিল।

রসশালায় প্রাকৃতিক রঞ্জক পদার্থের প্রস্তুত সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে মিউরেক্স ব্র্যাণ্ডারিস (murex brandaris) নামক এক প্রকার শম্বুক হইতে 'টিরিয়ান পার্পল' নামক রক্তাভ বেগুনী রঙের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে জার্মান রাসায়নিক ফ্রিডলেণ্ডার (Friedlander) নিরতিশয় ধৈর্যের সহিত দ্বাদশ সহস্র শম্বুকের দেহ হইতে এই রঙ প্রস্তুত করিয়া বিশ্লেষণ-পূর্বক ইহার অণুর মধ্যে পরমাণুর আভ্যন্তরিক সন্নিবেশ নিপুণভাবে নির্ধারণ

করিলেন এবং পরে তদনুরূপ পরমাণুর সন্নিবেশে ইহা প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, এই রঞ্জক ও নীলের রঞ্জক পদার্থ মূলত একই, তবে প্রভেদ এই যে দুই স্থানে বলয়স্থ অঙ্গারের সহিত হাইড্রোজেনের পরিবর্তে ব্রোমিন নামক মৌলিক পদার্থের পরমাণু আবদ্ধ আছে।

নব নব পরমাণুসন্নিবেশে নানাজাতীয় রঙের সৃষ্টি হইল এবং নূতন যৌগিক পদার্থের সাহায্যে রঞ্জক পদার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। অতি বিষাক্ত ফস্‌জিন গ্যাস এবং ফর্মালডিহাইড ব্যবহার করিয়া উৎকৃষ্ট কয়েকটি রঙ প্রস্তুত করা হইল। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে জার্মান রাসায়নিক বোট্টিগের (Bottiger) কোনরূপ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকেই কার্পাস সুতার পাকা রঙ 'কঙ্গো রেড' (congo red) বেঞ্জিডিন নামক রাসায়নিক পদার্থ হইতে সৃষ্টি করিয়া রঞ্জনশিল্পের বিশেষ উপকার সাধন করিলেন। কৃত্রিম নীলের আবির্ভাবের পরেই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে সর্বাপেক্ষা পাকা রঙ ইণ্ড্যান্‌থ্রিন্ (indanthrene)

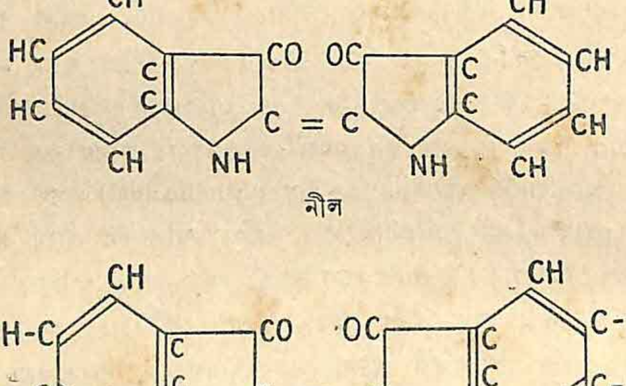

নীল

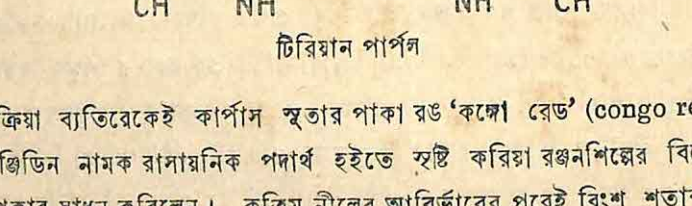

টিরিয়ান পার্পল

আবিষ্কৃত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিকগণের গবেষণার ফলে ঐ জাতীয় বহু পাকা রঙের সৃষ্টি হইয়া রঞ্জন-শিল্প সমৃদ্ধ হইল। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী ভাইড্যাল (Vidal) গন্ধকপরমাণুযুক্ত কৃত্রিম রঙ 'সালফার ব্ল্যাক' প্রস্তুত করিয়া এক অভিনব ধারায় গন্ধকযুক্ত রঙ্গক পদার্থের সৃষ্টিপ্রণালী আবিষ্কার করিলেন এবং ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে পরীক্ষার ফলে 'হাইড্রন ব্লু' নামক অন্যতম শ্রেষ্ঠ নীলরঙ সৃষ্টি হইল।

যদিও কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের জন্মভূমি ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডের রাসায়নিক-প্রবর পার্কিন, নিকল্‌সন, হফ্‌ম্যান, গ্রীস, মার্টিয়াস এবং অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলীর ঐকান্তিক গবেষণার ফলে কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ জন্মলাভ করিল, তথাপি মাতৃ-ক্রোড়ে ইহা লালিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই। অল্পকালের মধ্যেই ইহা জার্মান বিজ্ঞানিগণের হস্তস্পর্শে পুষ্ট হইল। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে দেখা গেল কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের তিন-চতুর্থাংশই জার্মানদেশে প্রস্তুত হয়, ইংলণ্ডও এই পণ্যের জন্য জার্মানির মুখাপেক্ষী। এই ব্যাপারে জার্মান ব্যবসায়িগণের দূরদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ইংলণ্ডের রাসায়নিকগণ ব্যবসায়িগণের উৎসাহলাভে বঞ্চিত হইয়া বাধা পাইয়াছিলেন এবং বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই, কিন্তু জার্মানিতে ধনী ব্যবসায়িগণ এই শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল মনে করিয়া তাঁহাদের কোষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। গবেষণার জন্য রসশালা প্রতিষ্ঠা করিতে—রঞ্জক দ্রব্য বহুলপরিমাণে প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ যন্ত্রাদিসমন্বিত কারখানা নির্মাণ করিতে—মেধাবী রসায়ন গবেষককে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিতে তাঁহারা পশ্চাৎপদ হন নাই। এই সব কারণে এবং জার্মানির পেটেণ্ট আইনের অপেক্ষাকৃত শিথিলতার জন্য জার্মানি কৃত্রিম রঞ্জনশিল্পে সর্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করিয়াছে। জার্মানিতে কৃত্রিম রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তুত করিবার এক-একটি কারখানা এক-একটি শহরবিশেষ এবং প্রত্যেক কারখানায় উপযুক্ত বহু বিজ্ঞানী গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে অনেকগুলি কারখানা একত্র হইয়া আই. জি. ফার্বেন ইণ্ডাস্ট্রি

(I. G. Farben Industrie) নামক বিশ্ববিখ্যাত রঙের কারখানা জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডেও কয়েকটি কারখানা ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (Imperial Chemical Industries)এ যুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও অন্যান্য দেশে, যেমন ফ্রান্স ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডে রঙের কারখানা নির্মিত হইয়াছে, তবে এগুলি যথোচিত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই দেখা যায় যে, কৃত্রিম রঞ্জন-পদার্থের জন্মের পর ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যেই এই শিল্প আশাতিরিক্ত প্রসার লাভ করিয়াছে। উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর উৎকৃষ্টতম কৃত্রিম রঙের অনুসন্ধানে পরীক্ষাগারে রাসায়নিকগণ তাঁহাদের কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এবং বর্তমানে নীল, পীত, লোহিত, সবুজ প্রভৃতি সর্ব প্রকার পাকা শত সহস্র কৃত্রিম রঙ অনায়াসলভ্য হইয়াছে। তথাপি পরীক্ষার অবসান হয় নাই, রাসায়নিক জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতেছেন এবং তাঁহার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করিবার জন্য রঞ্জনশিল্পসংবাদবাহক বহু পত্রিকা ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় পরিচালিত হইতেছে। ভবিষ্যতের গর্ভে আরও কত কৃত্রিম রঞ্জন পদার্থ নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে ?

৩

কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ও গুণাগুণ

নানা কার্যে রঞ্জন দ্রব্যের ব্যবহার

কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার ব্যবহারও বহুমুখী হইয়া পড়িয়াছে। বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার জন্যই ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ নহে, অন্যান্য দ্রব্য, যথা— কাগজ, কাষ্ঠ, পশুপক্ষীর লোম, চামড়া, পালক, চুল, সাবান, কালি, ফলের রস এবং উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য রঞ্জিত করিবার জন্যও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রযুক্ত হয়। রঙ্গক প্রস্তুতের জন্য এবং চিত্রাদি অঙ্কিত করিবার জন্যও ইহার চাহিদা অনেক। এতদ্ব্যতিরেকে কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্য বর্তমানে নিম্নলিখিত কার্যের জন্যও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

(১) পরীক্ষাগারে অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের সূচক (indicator) হিসাবে বহু রঞ্জক দ্রব্য বিশেষ মূল্যবান, যেমন—

	অম্ল সংস্পর্শে রঙ	ক্ষার সংস্পর্শে রঙ
মিথাইল অরেঞ্জ	গোলাপী	পীত
লিটমাস	লোহিত	নীল
কঙ্গো রেড	নীল	লোহিত

(২) কয়েকটি নাইট্রো রঞ্জক, যেমন— পিক্‌রিক অম্ল, ডাই-নাইট্রো-ক্রিসল (dinitrocresol), ডাই-নাইট্রো-ন্যাপথল (dinitro-naphthol) বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(৩) রোগের বীজবারক (antiseptic) হিসাবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে রোগনিবারক ঔষধ হিসাবেও রঞ্জক পদার্থ অধুনা ব্যবহৃত হইতেছে।

তন্মধ্যে মিথাইল ভায়োলেট, ক্রস্ট্যাল ভায়োলেট, ম্যালাকাইট গ্রীন, অর‍্যামিন, মেথিলিন ব্লু, স্যাফ্রানিন, অ্যানিলিন ব্লু প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

(৪) রোগবীজাণুর শ্রেণিভেদ নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে বীজাণুরঞ্জন-কার্যে কোনও কোনও রঙ সর্বদাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে মেথিলিন ব্লুর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৫) ফোটোগ্রাফিতেও রঙ ব্যবহৃত হয়, যথা— সায়ানিন, কুইনোলিন রেড্, ইয়োসিন প্রভৃতি।

রঞ্জন দ্রব্যের বিষাক্ততা

অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা এই যে, অ্যানিলিন হইতে প্রস্তুত রঞ্জক দ্রব্য অত্যধিক বিষাক্ত, অবশ্য এই ধারণা কৃত্রিম রঞ্জক দ্রব্য আবিষ্কারের সময়ে যে নিতান্তই অমূলক ছিল তাহা বলা যায় না। তখন ম্যাজেণ্টা প্রস্তুত করিবার জন্য আর্সেনিক ব্যবহার করা হইত এবং ম্যাজেণ্টা এবং ম্যাজেণ্টা হইতে প্রস্তুত রঞ্জকের মধ্যে আর্সেনিক কিয়ৎ পরিমাণে থাকিয়া যাইত। বর্তমানে এইগুলির প্রস্তুতপ্রণালীর ব্যতিক্রম করায় আর্সেনিক থাকিতে পারে না এবং অনেকক্ষেত্রেই রঞ্জকগুলি বিষাক্ত নহে। তথাপি সম্প্রতি পরীক্ষার ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কোনও কোনও রঞ্জক পদার্থ, যথা—পিক্রিক অম্ল, ভিক্টোরিয়া অরেঞ্জ, কুমকুমের পরিবর্তে সচরাচর ব্যবহৃত অরাম্সিয়া, করালিন, সাফ্রালিন প্রভৃতি আমাদের শরীরের পক্ষে নিতান্তই অহিতকর, এমন-কি তন্মধ্যে ২।১টি মারাত্মকও। মার্টিয়াস ইওলো, ফাস্ট ইউলো, মিথাইল অরেঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি অল্প পরিমাণেও আমাদের গলাধঃকরণ হইলে পাকস্থলীতে খাদ্যপাকের বিষম বিঘ্ন ঘটাইয়া কঠিন রোগের সৃষ্টি করে। খাদ্যব্যবসায়িগণের এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। পাশ্চাত্য দেশে খাদ্য-দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিবার জন্য মাত্র কয়েকটি রঞ্জক পদার্থেরই নির্দেশ

দেওয়া হইয়াছে, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য রঞ্জক ব্যবহার আইনানুসারে দণ্ডনীয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মেথিলিন ব্লু কিংবা ম্যালাকাইট গ্রীন অতিশয় বিষাক্ত, কারণ এই রঞ্জক দ্রব্য দুইটিতে দস্তা ধাতু বিদ্যমান। ইহা ছাড়া ধাতুঘটিত রঞ্জক, যথা— সিন্দূর এবং সীসা, তামা, দস্তা ও বেরিয়ামযুক্ত রঞ্জক পদার্থও সাংঘাতিক বিষ এবং খাদ্যদ্রব্যের সহিত ভুলক্রমে মিশ্রিত হইলে বিষম বিপত্তির সম্ভাবনা।

রাসায়নিক আকৃতি ও যৌগিক পদার্থের বর্ণ

বর্তমানে শতসহস্র কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ সচরাচর ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহাদের প্রত্যেকটির অণুর মধ্যে পরমাণুসন্নিবেশ রাসায়নিক নির্ধারণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানী উইট (Witt) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যৌগিক পদার্থের অণুর মধ্যে বিশেষভাবে সন্নিবিষ্ট পরমাণু না থাকিলে পদার্থটি রঙিন হইতে পারে না। যখনই নীল, পীত, লোহিত ইত্যাদি বিভিন্নবর্ণের যৌগিক পদার্থ পাওয়া যাইবে তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার অণুর মধ্যে বিশেষ প্রথায় আবদ্ধ পরমাণুমণ্ডলী বিদ্যমান আছে এবং এই প্রকার বর্ণোৎপাদক পরমাণুশ্রেণীর বিশেষ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে 'ক্রোমোফোর' (chromophore)। ক্রোমোফোরের মধ্যে অ্যাজো-পরমাণুশ্রেণী ও কুইনোন-পরমাণুশ্রেণী উল্লেখ করা যাইতে পারে।

$-N=N-$

অ্যাজো পরমাণু শ্রেণী

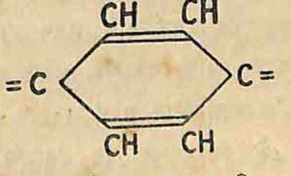

কুইনোন পরমাণু শ্রেণী

এইপ্রকার 'ক্রোমোফোর' সম্বলিত যৌগিক পদার্থকে বলা হয় 'ক্রোমোজেন' (chromogen)। পদার্থের রাসায়নিক আকৃতির সহিত রঙের এইপ্রকার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া উইট স্থির করিয়াছেন যে, রঙিন যৌগিক পদার্থমাত্রই রঞ্জনোপযোগী নহে, রঞ্জনক্ষমতাশালী হইতে হইলে আর-এক ভিন্নজাতীয় পরমাণুশ্রেণীর বিশেষ প্রয়োজন এবং শেষোক্ত পরমাণুশ্রেণীকে বলা হইয়াছে 'লবণোৎপাদক পরমাণুশ্রেণী' অথবা 'অক্সোক্রোম' (auxochrome)। অক্সোক্রোমের অভাবে চিত্তাকর্ষক রঙযুক্ত যৌগিক পদার্থও বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিতে পারে না। 'OH' কিংবা 'NH_2' পরমাণুশ্রেণীই 'অক্সোক্রোমে'র কার্য করে এবং এযাবৎ যতগুলি কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের অণুর মধ্যে 'অক্সোক্রোম' অর্থাৎ লবণোৎপাদক পরমাণুশ্রেণী 'OH' কিংবা 'NH_2' থাকিবেই।

শ্রেণীবিভাগ

কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থগুলিকে দুই প্রকারে পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে—তাহাদের রাসায়নিক আকৃতি অনুসারে অথবা তাহাদের রঞ্জনপ্রণালীর সমতা অনুসারে। রঞ্জন-শিল্পীরা সাধারণত দ্বিতীয়োক্ত প্রকারেই রঞ্জক পদার্থের বিভাগ করিয়া থাকেন এবং মোটামুটি ৮টি বিভাগ করা হয়।—

(১) **আম্লিক রঞ্জক**— এই রঞ্জক পদার্থে এমন কতকগুলি পরমাণুর সন্নিবেশ থাকে (যেমন SO_3H) যে ইহা অম্লভাবাপন্ন হয়। সাধারণত রঞ্জক পদার্থের সোডিয়াম লবণ ব্যবহার করা হয়। এই রঞ্জক পদার্থ রেশম ও পশমকে অতি সহজেই রঞ্জিত করে, রঞ্জনের সময় হাইড্রোক্লোরিক কিংবা অ্যাসেটিক অম্লমিশ্রিত দ্রবণ ব্যবহার করিতে হয়। কার্পাস সুতার জিনিসের উপর এই রঞ্জক পদার্থের কোনও আসক্তি নাই এবং সেইজন্য ব্যবহৃতও হয় না।

(২) **ক্ষারকীয় রঞ্জক** (অথবা ট্যানিন রঞ্জক)— ইহা ক্ষারজাতীয় রঞ্জন-দ্রব্যের সাধারণত হাইড্রোক্লোরিক অম্লের লবণ। এই শ্রেণীর রঞ্জকের অণুর মধ্যে $-NH_2$, $-N(CH_3)_2$, $-N(C_2H_5)_2$, $-NHC_6H_5$ প্রভৃতি পরমাণুপুঞ্জ বিদ্যমান। ইহা দ্বারা পশম সহজেই রঞ্জিত হয় বটে, কিন্তু বর্তমানে ইহা কার্পাস সুতা রঞ্জিত করিতেই ব্যবহৃত হয়। কার্পাস সুতা রঞ্জিত করিতে হইলে প্রথমে ট্যানিক অম্ল (tannic acid) ও পরে টার্টার এমেটিক (tartar emetic) দিয়া কার্পাস সুতা আগে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, রাগবন্ধকের সাহায্য ব্যতিরেকে রঙ পাকা হয় না। পাট সহজেই এই শ্রেণীর রঞ্জকের দ্বারা রঞ্জিত করা যাইতে পারে। ম্যাজেণ্টা, মিথাইল ভায়োলেট, ম্যাল্যাকাইট গ্রীন, রডামিন প্রভৃতি এই শ্রেণীর রঞ্জকের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) **নিরপেক্ষ পাকা রঙ** (Direct or Substantive dyes)— পশম ও সিল্কে পাকা রঙ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু কার্পাস সুতার উপর পাকা রঙ করা সুকঠিন। কতকগুলি রঞ্জক পদার্থের বিশেষত্ব এই যে, সেগুলি রাগবন্ধকের সাহায্য ব্যতিরেকেও কার্পাস সুতা স্থায়িভাবে রঞ্জিত করিতে পারে। সাধারণত রঞ্জক জলে দ্রবীভূত করিয়া কিছু সোডিয়াম সালফেট (sodium sulphate) মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। রেশমও এই জাতীয় রঙের দ্বারা রঞ্জিত করা যায়। বেন্‌জিডিন (benzidine) হইতে প্রস্তুত অ্যাজো রঞ্জক পদার্থ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) **মর্ডাণ্ট রঞ্জক** (Mordant dyes)— এই শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ দ্বারা পাকা রঙ করিতে হইলে রাগবন্ধকের প্রয়োজন। অ্যালুমিনিয়াম, ক্রোমিয়াম কিংবা লৌহঘটিত লবণ সাধারণত রাগবন্ধকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই রঞ্জকগুলি অম্লভাবাপন্ন এবং তাহাদের অণুর মধ্যে 'OH' কিংবা 'COOH' পরমাণুপুঞ্জ বিদ্যমান। প্রকৃতিজাত রঞ্জন দ্রব্যের অধিকাংশই 'মর্ডাণ্ট' রঞ্জক। মঞ্জিষ্ঠার রঞ্জন-পদার্থ অ্যালিজারিন এই শ্রেণীভুক্ত এবং বিভিন্ন রাগবন্ধকের সাহায্যে বিভিন্ন আভায় বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা যায়— অ্যালুমিনিয়ামের সহিত

উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং লৌহের সহিত রক্তাভ বেগুনীবর্ণ পাওয়া যায়। কোনরূপ রাগবন্ধক ব্যবহার না করিলে অ্যালিজারিন বস্ত্রতন্তুর মধ্যে সন্নিবদ্ধই হইতে পারে না। অ্যালিজারিনের ন্যায় বহু রঞ্জক পদার্থের রঞ্জন ক্ষমতা রাগবন্ধকের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

(৫) **ভ্যাট্ রঞ্জক** (Vat dyes)— নীল, ইণ্ড্যান্থ্রিন (indianthrene) প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। ইহা জলে দ্রবীভূত হয় না। এই জাতীয় রঞ্জক পদার্থকে প্রথমে বিজারিত করিয়া লইতে হয়। বিজারণের পর ইহা ক্ষারে দ্রবীভূত হয়। ক্ষারীয় দ্রবণে সুতা ভিজাইয়া বাতাসে রাখিয়া দিলেই সুতার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে সংবদ্ধ বিজারিত পদার্থ বাতাসের অক্সিজেনযোগে জারিত হইয়া পাকা রঙের সৃষ্টি করে। এই রঙ সর্বাপেক্ষা পাকা এবং বিচিত্র আভাযুক্ত রঙ এইভাবে করা যাইতে পারে। ইণ্ড্যান্থ্রিনের জন্য গাঢ় ক্ষারের দ্রবণ প্রয়োজন এবং কার্পাস বস্ত্রই এই রঞ্জকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। নীল, থায়ো-ইণ্ডিগো (thioindigo) প্রভৃতি রঞ্জকের জন্য সামান্য ক্ষারই যথেষ্ট, সুতরাং জান্তব ও উদ্ভিজ্জ তন্তু রঞ্জনের জন্য এইগুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৬) **বস্ত্রতন্তু মধ্যে সৃষ্ট রঙ** (Developed colours)— এই জাতীয় রঙ বস্ত্রতন্তু মধ্যেই প্রস্তুত করা হয়, সুতরাং রঞ্জক সুদৃঢ়ভাবে বস্ত্রতন্তুর ছিদ্রমধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং সহজে প্রক্ষালিত হইতে পারে না। কার্পাস বস্ত্রের পাকা রঙ অ্যানিলিন ব্ল্যাক (aniline black) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বস্ত্র অ্যানিলিন লবণের দ্রবণ ও জারকদ্রব্যের দ্রবণে সিক্ত করিয়া উত্তপ্ত করিলেই, তন্তুছিদ্রমধ্যস্থ অ্যানিলিন জারিত হইয়া রঞ্জক পদার্থের সৃজন করে।

অ্যাজো-রঞ্জকও বস্ত্রতন্তুমধ্যে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

(৭) **গন্ধকযুক্ত রঞ্জক**— এই রঞ্জক পদার্থগুলি জলে দ্রবণীয় নহে, কিন্তু সোডিয়াম সালফাইড (sodium sulphide) দ্রবণে সহজেই দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবণে সুতা ভিজাইয়া বাতাসে শুষ্ক করিলে পাকা রঙ হয়।

(৮) **রঙ্গক** (Pigment)— অনেক রঞ্জক বার্নিস, ল্যাকার (lacquer) রঞ্জিত করিতে ব্যবহৃত হয়। এইগুলি সাধারণত জলে অদ্রবণীয় এবং অবদ্রব (emulsion) ভাবে বস্ত্রতন্তুর উপর ছাপ দিলে, অবদ্রবের সহিত মিশ্রিত রাগবন্ধকের সাহায্যে নক্‌শা কিংবা চিত্র রঞ্জিত হইয়া যায়।

রঞ্জন দ্রব্যের দ্রবণীয়তা

রঞ্জন দ্রব্য প্রায়শই জলে দ্রবীভূত করিয়া রঞ্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে জলে অদ্রবণীয় হইলে স্পিরিটের দ্রবণও ব্যবহার করা হয়। আলকাতরা হইতে উদ্ভূত রঞ্জন দ্রব্য জলে দ্রবীভূত করিয়া উক্ত দ্রবণে কিয়ৎপরিমাণ আঠা (gum) এবং প্রয়োজনবোধে গ্লিসারিন (glycerine) মিশ্রিত করিয়া লিখিবার রঙিন কালি তৈয়ার করা হয়। এই জাতীয় 'অ্যানিলিন কালি' অপেক্ষাকৃত গাঢ় অবস্থায় ব্যবহার করা হয় এবং কালি শুষ্ক হইলে রঞ্জন দ্রব্যের ধাতব আভা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই কালির রঙ আলোর সংস্পর্শে দীর্ঘদিন থাকিলে ম্লান হইয়া যায় বলিয়াই প্রয়োজনীয় দলিলপত্র এই কালিতে লেখা উচিত নহে। কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের স্পিরিটের দ্রবণে বার্নিস রঞ্জিত করা হয়, নানাজাতীয় রজন (সেলাক, কোপাল প্রভৃতি) স্পিরিটে দ্রবীভূভ করিয়া রঞ্জন দ্রব্য মিশ্রিত করিলেই বিচিত্র আভার বার্নিস পাওয়া যাইতে পারে। অ্যানিলিনঘটিত রঞ্জক পদার্থ মেদাম্লের (যথা ওলেয়িক কিংবা স্টিয়ারিক অম্ল) সহিত যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে এবং উক্ত যৌগিক পদার্থের মিশ্রণে তৈল ও চর্বি রঞ্জিত করা যাইতে পারে।

বস্ত্রতন্তুর মধ্যে রঞ্জন-দ্রব্য কি ভাবে সন্নিবদ্ধ হয়

রঞ্জক দ্রব্য বস্ত্রতন্তু মধ্যে কি ভাবে সন্নিবদ্ধ হয় এ বিষয়ে বহু গবেষণা সত্ত্বেও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। এই সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতদ্বৈধ আছে, কোনও কোনও মতের অনুকূলে প্রামাণিক যুক্তির অবতারণা

করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোনও মতই সর্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তন্তুর মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে, সেইজন্যই রঞ্জন-ক্রিয়ায় প্রাণিজ তন্তু (যথা— সিল্ক, রেশম, পশুপক্ষীর লোম, চুল, চামড়া প্রভৃতি), উদ্ভিজ্জ তন্তু (যথা— কার্পাসবস্ত্র, লিনেন, কাষ্ঠ, পাট, কৃত্রিম সিল্ক প্রভৃতি) হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রাণিজ তন্তু প্রোটিন (protein) ও উদ্ভিজ্জ তন্তু সেলুলোস (cellulose) দ্বারা গঠিত।

পশমের রাসায়নিক বিশ্লেষণে পাওয়া গিয়াছে—

অঙ্গার	শতকরা	৫০	ভাগ
হাইড্রোজেন	”	৭	”
নাইট্রোজেন	”	১৯	”
অক্সিজেন	”	২০	”
গন্ধক	”	৩	”
ধাতব পদার্থ (যথা, পোটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি,	”	১	”

পশম কেরাটিন (keratin) নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত। সিল্কের রাসায়নিক প্রকৃতি প্রায় রেশমেরই অনুরূপ, তবে ইহাতে গন্ধক নাই। ফাইব্রোয়িন (fibroin) নামক যৌগিক পদার্থ দ্বারা সিল্ক গঠিত।

জান্তব তন্তু অম্লের সংস্পর্শে বিশেষ স্থায়ী, কিন্তু ক্ষারের সংস্পর্শে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। এই ধর্মের জন্যই আম্লিক রঞ্জক পশম রঞ্জিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কার্পাসতন্তু ও লিনেন বিশুদ্ধ সেলুলোস দ্বারা গঠিত এবং সেইজন্যই অম্লের সংস্পর্শে কার্পাসতন্তু নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু পাতলা ক্ষারের সংস্পর্শে ইহার কোনও বিকৃতি ঘটে না। গাঢ় ক্ষারের দ্রবণে সিক্ত করিলে কার্পাসতন্তুর

আকৃতির পরিবর্তন হয় এবং এই প্রকারেই চক্‌চকে মার্‌সিরাইজড কার্পাসবস্ত্র (mercerised cotton) প্রস্তুত করা হয়।

সেলুলোস ও কসায়িন (tannin) জাতীয় দ্রব্যের যৌগিক পদার্থ দ্বারা পাট গঠিত এবং সেইজন্য রঞ্জন-শিল্পে পাটকে ট্যানিন রাগবন্ধকযুক্ত কার্পাসতন্তুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

কৃত্রিম সিল্ক দুই জাতীয় হইতে পারে। ভিস্‌কোস সিল্ক (viscose silk) প্রস্তুতের সাধারণ প্রণালী এইরূপ— প্রধানত কাষ্ঠ হইতে কিংবা অন্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে প্রস্তুত সেলুলোস দ্রাবকে দ্রবীভূত করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়া এমন একটি দ্রবণে নিক্ষিপ্ত করিতে হয় যে, সেলুলোস চক্‌চকে সুতার আকৃতিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় জাতীয় কৃত্রিম সিল্ক প্রস্তুত করিতে হইলে সেলুলোসকে অ্যাসেটিক অম্ল ও অ্যাসেটিক অ্যান্‌হাইড্রাইডের (acetic anhydride) দ্বারা সেলুলোস ট্রাইঅ্যাসিটেটে (cellulose triacetate) পরিণত করিয়া উক্ত যৌগিক পদার্থের দ্রবণ নিশাদলের দ্রবণে সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়া নিক্ষিপ্ত করিতে হয়। শেষোক্ত কৃত্রিম সিল্কের উপাদান সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকম এবং 'সেলুলোস অ্যাসিটেটের' দ্বারা গঠিত বলিয়া ইহা প্রথমোক্ত ভিসকোস অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, এই তন্তু অপেক্ষাকৃত শক্ত ও গরম।

রাসায়নিক গঠনের বৈষম্য এবং আকৃতিগত পার্থক্য আছে বলিয়াই জান্তব তন্তু ও উদ্ভিজ্জ তন্তুর রঞ্জনে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। পণ্ডিতগণের মতে রেশম ও পশমের তন্তুর মধ্যে 'NH_2' ও '$COOH$' পরমাণুশ্রেণী আছে এবং যেসব রঞ্জন দ্রব্য সহজেই লবণজাতীয় পদার্থ প্রস্তুত করিতে সক্ষম, তাহাদের সিল্ক ও রেশমের উপর অত্যধিক আসক্তি থাকে। পক্ষান্তরে কার্পাস তন্তু ও সেলুলোসতন্তু অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় অণুদ্বারা গঠিত বলিয়াই অধিকাংশ রঞ্জক পদার্থের দ্বারা রঞ্জিত হইতে পারে না— এই তন্তু রঞ্জিত করিতে হইলে রাগবন্ধকের প্রয়োজন।

রঞ্জনের স্থায়িত্ব ও পাকা রঙ

অগণিত কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের মধ্যে ভালমন্দ বিচারের মানদণ্ড কি হইবে? নিম্নোক্ত বিষয়গুলিই রঞ্জক পদার্থের উৎকৃষ্টতার প্রধান মাপকাঠি বলিয়া বিবেচিত হয়:

(১) বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, (২) জলে দ্রাব্যতা, (৩) সমানভাবে রঞ্জনক্ষমতা, এবং সর্বোপরি (৪) রঙের স্থায়িত্ব।

(১) বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের উপরই রঞ্জক পদার্থের মূল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। গাঢ় রঙ অনেকের চিত্তাকর্ষক হইলেও ফ্যাকাশে রঙেরও প্রয়োজনীয়তা কম নহে। রঙের ঔজ্জ্বল্য ও মধুরতা সহজেই আমাদের চিত্তবিনোদন করে।

(২) রঞ্জন দ্রব্য জলে দ্রবণীয় হইলে রঞ্জন-কার্যের জন্য বিশেষ উপযোগী, তবে দ্রবণীয়তা রঞ্জন দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য ও জলের অবস্থা এই উভয়ের উপরই নির্ভর করে। অনেক রঞ্জক চুনের সঙ্গে অদ্রবণীয় পদার্থের সৃষ্টি করে, সুতরাং জলে যদি চুনজাতীয় অর্থাৎ ক্যালসিয়াম অথবা ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত যৌগিক পদার্থ থাকে, তবে সেই গুরু জলে রঞ্জন দ্রব্যের কিছু অংশ অদ্রবণীয় হইয়া যাইবে এবং এই ক্ষেত্রে রঞ্জন দ্রব্যের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সাল্‌ফিউরিক অম্ল (sulphuric acid), অ্যাসেটিক অম্ল কিংবা সোডা জলের মধ্যে পূর্বেই মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়।

(৩) সুতার উপর বেশি আসক্তি থাকিলে রঞ্জন-ক্রিয়া তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু সাধারণত দ্রুত রঞ্জন হইলেই সুতার সর্বত্র সমানভাবে রঞ্জিত হয় না এবং এই রঙ পরে জলের সহিত ধৌত হইয়া যায়। সর্বত্র সমানভাবে রঞ্জন-ক্ষমতা আছে কি না মোটামুটি দেখিবার জন্য এই পরীক্ষা করা যাইতে পারে।—খানিকটা সুতায় গ্রন্থি দিয়া রঞ্জন-পদার্থের দ্রবণের মধ্যে ফুটাইতে হইবে—যেন গ্রন্থির মধ্যে রঞ্জন-দ্রব্য প্রবেশ করিতে না পারে। কিছুক্ষণ পরে যখন সুতাটি ভালভাবে রঞ্জিত হইয়াছে তখন গ্রন্থি খুলিয়া দিয়া আবার ফুটাইলে

যদি গ্রন্থির মধ্যস্থিত সুতার রঙে এবং অন্যত্র সুতার রঙে কোনও বৈষম্য পরিলক্ষিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে রঞ্জন দ্রব্যটির সর্বত্র সমানভাবে রঞ্জন-ক্ষমতা বিদ্যমান।

(৪) সর্বোপরি রঙের স্থায়িত্বই রঞ্জন দ্রব্যের উৎকৃষ্টতার পরিচায়ক। রৌদ্র ও আলোর সংস্পর্শে, মৃদু ক্ষার বা সাবানের সংস্পর্শে, সাধারণ ক্ষার সংস্পর্শে এবং অম্লের সংস্পর্শে রঙ স্থায়ী হইলেই উচ্চদরের পাকা রঙ বলিয়া তাহার প্রশংসা করা যাইতে পারে। অনেক রঙ সূর্যালোকে বিবর্ণ বা হীনপ্রভ হইয়া যায়, কোনও কোনও রঙের দ্বারা রঞ্জিতবস্ত্রাদি সাবান দিয়া ধৌত করিলে রঙের কথঞ্চিৎ ধৌত হইয়া যায়, আবার এমন অনেক রঙ আছে যাহা মৃদু ক্ষারের সংস্পর্শে স্থায়ী হইলেও তীব্র ক্ষারের সংযোগে রজকালয়ে একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তাহা ছাড়া এমনও দেখা যায় যে সূর্যালোক, মৃদু এবং তীক্ষ্ণ ক্ষারে উজ্জ্বলতার হ্রাস না হইলেও অম্লের সংস্পর্শে (যেমন ঘাম প্রভৃতি) বর্ণের আশাতিরিক্ত বিপর্যয় ঘটে। প্রাকৃতিক পুষ্পজাত রঙ এই সকল দোষদুষ্ট বলিয়াই প্রশংসার্হ হয় নাই। যে সব রঙ এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই রঙগুলিই পাকা রঙ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

৪

কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী

কয়েক প্রকার কৃত্রিম রঙ-প্রস্তুতকরণপ্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে, বিশদালোচনা এখানে সম্ভবপর নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে বেন্‌জিনের ন্যায় বলয় যৌগিকের বলয়স্থ অঙ্গার-পরমাণুর সহিত যুক্ত হাইড্রোজেনের পরমাণুর পরিবর্তে অন্য পরমাণু সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণু একসঙ্গে এমনইভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকে যে তাহাদের ব্যবহার একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ন্যায় এবং এই জাতীয় পরমাণুপুঞ্জও (compound radical) বেন্‌জিনের হাইড্রোজেন পরমাণুর স্থান দখল করিতে পারে। এই পরমাণুপুঞ্জ নানা জাতীয় হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটির নাম করা হইল, যথা—

NO_2—নাইট্রো (nitro)

CH_3—মিথাইল (methyl)

NH_2—অ্যামাইনো (amino)

SO_3H—সালফনিক অ্যাসিড (Sulphonic acid)

OH—হাইড্রক্সিল (hydroxyl)

যখন এই পরমাণুপুঞ্জ বেন্‌জিনের বলয়স্থ অঙ্গার-পরমাণুতে যুক্ত হয়, তখন নূতন দ্রব্যের সৃষ্টি হয় এবং তাহাদের গুণাবলী সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের।

নাইট্রো-বেন্‌জিন ($C_6H_5—NO_2$)—বেন্‌জিনের সহিত নাইট্রিক অম্লের ক্রিয়ায় ইহা প্রস্তুত হয়। নাইট্রো-বেন্‌জিন তৈলজাতীয় পদার্থ, বেন্‌জিন অপেক্ষা ভারি। ইহা বেন্‌জিনের ন্যায় উদ্বায়ী নহে, ইহার স্ফুটনাঙ্ক বেন্‌জিন অপেক্ষা অনেক বেশি।

অ্যামাইনো-বেন্‌জিন ($C_6H_5-NH_2$)—ইহারই নামান্তর অ্যানিলিন (aniline)। নাইট্রো-বেন্‌জিনকে লৌহ ও হাইড্রোক্লোরিক অম্লের সংযোগে বিজারিত করিলেই ইহা পাওয়া যায়। ইহা ক্ষার পদার্থের গুণাবলম্বী, অম্লজাতীয় জিনিসের সহিত লবণজাতীয় যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারে। অ্যানিলিন বিশেষ গন্ধযুক্ত তৈল জাতীয় তরল পদার্থ।

বেন্‌জিন-সালফনিক অম্ল ($C_6H_5-SO_3H$) একটি কঠিন পদার্থ। বেন্‌জিন ও সাল্‌ফিউরিক অম্লের রাসায়নিক ক্রিয়ায় ইহা সৃষ্ট হয়। ইহা অম্লজাতীয়, ক্ষারীয় পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া ইহা লবণ প্রস্তুত করিতে পারে।

হাইড্‌ক্সি-বেন্‌জিন (C_6H_5-OH)—ইহাকেই আমরা সাধারণ ভাষায় কার্বলিক অম্ল বলি, ইহা অম্লের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং ক্ষারীয় পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া লবণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম।

উপরোক্ত জিনিসগুলিই কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ প্রস্তুতকরণের অন্যতম মালমসলা। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কৃত্রিম রঙ সৃষ্ট করা হয়।

‘অ্যাজো’ রঞ্জক পদার্থ (Azo-dyes)

অ্যাজো রঞ্জক পদার্থের প্রচলন খুবই বেশি। রাসায়নিকের গবেষণার ফলে অসংখ্য কৃত্রিম ‘অ্যাজো’ পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ‘OH’ কিংবা ‘SO_3H’ পরমাণুপুঞ্জের সন্নিবেশে ইহা আম্লিক ও ‘NH_2’ পরমাণুপুঞ্জের জন্য ইহা ক্ষারীয়ও হইতে পারে।

এই জাতীয় রঞ্জক পদার্থ রাগবন্ধকের সাহায্যে পাকা রঙ সৃষ্টি করে, তবে বেন্‌জিডিন (benzidine) নামক রাসায়নিক পদার্থ হইতে প্রস্তুত অ্যাজো রঞ্জক কার্পাসবস্ত্রের উপর নিরপেক্ষভাবেই পাকা রঙ করিতে পারে।

অ্যাজো রঞ্জক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে দুই শ্রেণীর দ্রব্যের প্রয়োজন।—

(১) অ্যানিলিন জাতীয় ক্ষারীয় দ্রব্য অর্থাৎ বেন্‌জিনের বলয়স্থ অঙ্গারের যুক্ত 'NH_2' পরমাণুপুঞ্জ থাকিবে এইপ্রকার পদার্থ।

যেমন—অ্যানিলিন (aniline)
প্যারা-নাইট্রানিলিন (para-nitraniline)
ন্যাপথিল-অ্যামিন (naphthylamine)
বেন্‌জিডিন (benzidine)
সালফনিলিক অম্ল (sulphanilic acid)

(২) কার্বলিক অম্ল জাতীয় দ্রব্য অর্থাৎ বেন্‌জিনের বলয়স্থ অঙ্গারের সহিত 'OH'-পরমাণুপুঞ্জ সংযুক্ত দ্রব্য।

যেমন—কার্বলিক অম্ল (carbolic acid)
ন্যাপ্‌থল (naphthol)
ন্যাপ্‌থল-সাল্‌ফনিক অ্যাসিড্‌ (naphthol-sulphonic acid)
অথবা অ্যানিলিন জাতীয় ক্ষারীয় দ্রব্য।

প্রথম শ্রেণীর দ্রব্যটিকে হাইড্রোক্লোরিক অম্লের দ্রবণে দ্রবীভূত করিয়া সেই দ্রবণ বরফে শীতল করিয়া লইতে হয় এবং সেই শীতল দ্রবণে সোডিয়াম নাইট্রাইট (sodium nitrite) নামক লবণের পাতলা দ্রব অল্প অল্প করিয়া মিশাইলে 'ডায়াজো' (diazo) যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই ডায়াজো পদার্থের বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহা একটু উত্তপ্ত হইলেই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু শীতল অবস্থায় ইহার কোনও ব্যতিক্রম হয় না। এই ডায়োজো দ্রব দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্বলিক অম্লজাতীয় দ্রব্যের সহিত অথবা অ্যানিলিন জাতীয় ক্ষারীয় দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যাজো-রঞ্জক সৃজন করে।

(ক) কার্বলিক অম্লের রহিত ডায়াজো পদার্থের মিলন সাধারণত ক্ষারীয় দ্রবণে হয়। সেইজন্য কার্বলিক অম্লকে প্রথমত সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণে দ্রবীভূত করিয়া লইতে হয় এবং সেই ক্ষারীয় দ্রবণে ডায়াজো দ্রব অল্প অল্প করিয়া মিশ্রিত করিলেই অ্যাজো-রঞ্জক পদার্থের জন্ম হয়। কোনও স্থলে

রঞ্জক পদার্থের সোডিয়াম লবণ অদ্রবীভূত হইয়া পড়িয়া যায় আবার অনেক ক্ষেত্রে লবণমিশ্রিত করিলে রঞ্জক পদার্থের সোডিয়াম লবণ অদ্রবীভূত করিয়া লইতে হয়।

(খ) অ্যানিলিন জাতীয় দ্রব্যের সহিত ডায়াজো পদার্থের মিলন আম্লিক দ্রবণে সম্পন্ন হয়। ডায়াজো দ্রব্যের মধ্যে সোডিয়াম আসিটেট (Sodium acetate) দিলে হাইড্রোক্লোরিক অম্লের পরিবর্তে অ্যাসেটিক অম্ল প্রস্তুত হয় এবং সেই দ্রব অ্যানিলিন জাতীয় পদার্থের কোনও অম্লের দ্রবণে শীতল অবস্থায় মিশ্রিত করিলেই রঞ্জক পদার্থ সৃষ্ট হয়, তবে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে যে অম্লের পরিমাণ বেশি না থাকে।

সমস্ত অ্যাজো-রঞ্জক পদার্থের প্রস্তুতপ্রণালী একই রকম। ডায়াজো যৌগিক প্রস্তুত করিবার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে পণ্ডশ্রম হইবে, কারণ ডায়াজো যৌগিক একটু উত্তাপ পাইলেই ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। তবে ইহার ব্যতিক্রম যে হয় না এইরূপ হলফ করিয়া বলা যায় না। প্যারা-নাইট্রানিলিনের ডায়াজো যৌগিক একটু অসাধারণ প্রকৃতির, সাধারণ তাপে ইহার কোনও ক্ষতি হয় না।

অনেক সময়ে বস্ত্রতন্তুর মধ্যেই অ্যাজো-রঞ্জক পদার্থের সৃজন করিয়া রঙ বিশেষভাবে স্থায়ী করা হয়, তন্তুর মধ্যে সৃষ্ট হওয়ায় ইহা তন্তুর সহিত এমনই ওতপ্রোতভাবে সংবদ্ধ হইয়া যায় যে, পরে ধৌত করিলে ইহার কিয়দংশও লোপ পায় না। প্যারা-নাইট্রানিলিন রেড (paranitraniline red) এইভাবে প্রস্তুত করা হয়—এই রঞ্জক পদার্থ প্যারা-নাইট্রানিলিনের ডায়াজো যৌগিকের সহিত বিটা-ন্যাপথলের (B-naphthol) সম্মেলনে সৃষ্ট হয়। বিটা-ন্যাপথল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণে দ্রবীভূত করিয়া সেই দ্রবণে কার্পাসবস্ত্র সিক্ত করিয়া শুষ্ক করিতে হয়। ইহাতে বস্ত্রতন্তুর মধ্যে বিটা-ন্যাপথল প্রবেশ করে। প্যারা-নাইট্রানিলিনের ডায়াজো দ্রবণের মধ্যে এই শুষ্ক বস্ত্র দিলেই চমৎকার অলক্তক রঙে বস্ত্র রঞ্জিত হয়। যাদুকর সাদা

ধপ্ ধপে শুষ্ক একখানি বস্ত্রখণ্ড এইরূপ ডায়াজো দ্রবণে সিক্ত করত রক্তাক্ত করিয়া যাদুবিদ্যার বাহাদুরি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

নিম্নে একটি অ্যাজো-রঞ্জক প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেওয়া হইল :

অরেঞ্জ ২ (Orange II)— ইহা সাল্‌ফ্যানিলিক অ্যাসিডের (sulphanilic acid) ডায়াজো যৌগিকের সহিত বিটা-ন্যাপথলের (B-napthol) সম্মেলনে প্রস্তুত।

প্রথমে সাল্‌ফ্যানিলিক অ্যাসিডের ডায়াজো যৌগিক এইভাবে প্রস্তুত করিতে হয়—উপযুক্ত পরিমাণ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণে দ্রবীভূত ১৭'৩ গ্রাম সালফ্যানিলিক অ্যাসিডের দ্রবণে বরফ মিশ্রিত করিয়া দ্রবণের আয়তন ৫০০ c. c. হইলে ৩০ c. c. গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অম্ল দিতে হয়। তৎপরে ১০০ c. c. জলে দ্রবীভূত সোডিয়াম নাইট্রাইটের দ্রবণ অল্প অল্প করিয়া মিশ্রিত করিতে হয় এবং দ্রবণ বিশেষভাবে আলোড়িত করিলে ভাল হয়।

১৫ c. c. জলে দ্রবীভূত ৪'৫ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণে ১৪'৪ গ্রাম বিটা-ন্যাপ্‌থল দ্রবীভূত করিয়া দ্রবণ ১৬০ c. c. জলে ঢালিয়া দিয়া প্রয়োজনবোধে দ্রবণ শীতল করিতে হয়—যেন দ্রবণের উষ্ণতা ১৫°র বেশি না উঠে। বিটা-ন্যাপথলের উক্ত দ্রবণে বিশেষভাবে আলোড়িত অবস্থায় ডায়াজো যৌগিক অল্প অল্প করিয়া মিশ্রিত করিতে হয়। সমস্ত ডায়াজো যৌগিক মিশ্রণের পরও প্রায় ১ ঘণ্টা পর্যন্ত দ্রবণ আলোড়িত করিয়া সামান্য লবণের জল মিশ্রিত করিলেই রঞ্জন-পদার্থ অধঃক্ষিপ্ত হয়। রঞ্জক পদার্থ ছাঁকিয়া লইয়া ৬০°তে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া রাখা হয়।

এই রঞ্জন দ্রব্য উজ্জ্বল নারাঙ্গীবর্ণের, জলে সহজেই দ্রবণীয় এবং রেশমকে আম্লিক দ্রবণে নারাঙ্গীরঙে রঞ্জিত করে।

বিভিন্ন জাতীয় রঞ্জন-পদার্থের প্রস্তুত সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) **ম্যালাকাইট গ্রীন** (Malachite green)—ইহা বেন্‌জ্যাল্‌ডিহাইড্ (benzaldehyde) ও ডাইমিথাইল-অ্যানিলিনের (dimethyl aniline) রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়।

২০ গ্রাম বেন্‌জ্যাল্‌ডিহাইড, ৫০ গ্রাম ডাইমিথাইল-অ্যানিলিন আর তাপ দ্বারা গলিত এবং পরে চূর্ণীকৃত ৪০ গ্রাম জিঙ্ক ক্লোরাইড (Zinc chloride) পোরসিলেন খর্পরে জলগাহের উপর প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরিয়া উত্তপ্ত করিলে বেন্‌জ্যাল্‌ডিহাইডের গন্ধ লোপ পায়। ফুটন্ত জলে এই মিশ্র গলাইয়া স্টীমের সহিত পাতিত করিলে অতিরিক্ত ডাইমিথাইল-অ্যানিলিন পাতিত হইয়া যায়। শীতল হইলে সৃষ্ট যৌগিক পদার্থ কাচকূপীর (flask) গাত্রে লাগিয়া থাকে। ইহা জলদ্বারা ধৌত করিয়া নির্জল কোহল হইতে কেলাসিত করা যায়।

উপরোক্ত বর্ণহীন যৌগিক পদার্থকে জারিত করিলেই রঞ্জন-দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ১০ গ্রাম যৌগিক পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অম্লের (২·৭ গ্রাম) দ্রবণে দ্রবীভূত করিয়া দ্রবণের আয়তন ৮০০ c. c. জল দিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। উক্ত দ্রবণে ১০ গ্রাম অ্যাসেটিক অম্লের দ্রবণ (১০০ ভাগ জলে ৪০ ভাগ অ্যাসেটিক অম্ল) মিশ্রিত করিয়া বরফ সংযোগে দ্রবণ শীতল করিয়া ৭·৫ গ্রাম লেড পেরক্সাইডের লেই অল্প অল্প করিয়া ৫ মিনিটের মধ্যে দিতে হইবে। এইরূপভাবে বিক্রিয়ালব্ধ মিশ্র ৫ মিনিট রাখিয়া দিয়া ৫০ c. c. জলে দ্রবীভূত ১০ গ্রাম সোডিয়াম সাল্‌ফেট মিশ্রিত করিয়া দ্রবণ ছাঁকিয়া লইতে হয়। তৎপরে অল্পপরিমাণ জলে দ্রবীভূত ৮ গ্রাম জিঙ্ক ক্লোরাইড (Zinc chloride) ও পরে লবণের সংপৃক্ত দ্রবণ মিশ্রিত করিতে হইবে। অধঃক্ষিপ্ত রঞ্জক পদার্থ ছাঁকিয়া লইয়া পুনরায় জলে দ্রবীভূত করিয়া লবণজলের সাহায্যে কেলাসিত করা যাইতে পারে।

(২) **ফ্লুওরেসিন** (Fluorescein)— ইহা থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড

(phthalic anhydride) এবং রিসরসিনলের (resorcinol) রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে প্রস্তুত হয়।

১০ গ্রাম থ্যালিক অ্যান্‌হাইড্রাইড এবং ১৫ গ্রাম রিসরসিনল একটি রাঙের ডিশে ১৮০° পর্যন্ত উত্তপ্ত করিতে হয়। সদ্যগলিত ও চূর্ণীকৃত ৭ গ্রাম জিঙ্ক ক্লোরাইড (Zinc chloride) বিশেষভাবে আলোড়িত উক্ত মিশ্রণের মধ্যে ১০ মিনিটের মধ্যে ঢালিয়া দিতে হইবে। জিঙ্ক ক্লোরাইড দিবার পর ২১০° পর্যন্ত আরও ২ ঘণ্টা উত্তপ্ত করিলেই গলিত পদার্থ খুব শক্ত হইয়া যায়। এক্ষণে ঠাণ্ডা করিয়া বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ চূর্ণ করিয়া ১৫০ c. c. জল ও ১০ c. c. গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অম্ল দিয়া ফুটাইতে হয়। ফ্লুওরেসিন ছাঁকিয়া জল ও পরে সামান্য নির্জল কোহল দিয়া ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

(৩) **ইওসিন** (Eosin)— ফ্লুওরেসিন ও ব্রোমিনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় এই রঞ্জন দ্রব্য পাওয়া যায়।

একটি কাচকূপীতে ১৫ গ্রাম ফ্লুওরেসিন ও ৮০ c. c.র স্পিরিটের মিশ্রণে ১১ c. c. ব্রোমিন ফোঁটা ফোঁটা করিয়া আস্তে আস্তে দিলেই মিশ্রণ উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং অর্ধেক ব্রোমিন দিবার পরেই ফ্লুওরেসিন দ্রবীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ৪৫ মিনিট লাগে এবং ইওসিন অদ্রবণীয় অবস্থায় অধঃক্ষিপ্ত হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ইওসিন ছাঁকিয়া লইয়া স্পিরিটে ধৌত করিয়া ১১০°তে শুষ্ক করিতে হয়।

ইওসিনের সোডিয়ামঘটিত লবণ প্রস্তুত করিতে হইলে ৬ গ্রাম ইওসিন ১ গ্রাম সোডার সহিত খলে মাড়িয়া লইয়া সামান্য স্পিরিটে সিক্ত করিয়া ৫ c. c. জল সহযোগে একটি বীকারে (beaker) যতক্ষণ পর্যন্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডের বুদবুদ নির্গত না হয় ততক্ষণ উত্তপ্ত করিতে হয়। অতঃপর ২৫ c. c. স্পিরিট দিয়া ফুটাইয়া দ্রবণ ছাঁকিয়া ২।১ দিন রাখিয়া দিলেই, ইওসিনের কেলাস পাওয়া যায়।

(৪) **অ্যালিজারিন** (Alizarin) মঞ্জিষ্ঠার রঞ্জন-পদার্থ—আলকাতরা হইতে অ্যান্থ্রাসিন (anthracene) প্রস্তুত করিয়া, অ্যান্থ্রাসিন হইতে অ্যান্থ্রাকুইনোন (anthraquinone) এবং অ্যান্থ্রাকুইনোন হইতে অ্যান্থ্রাকুইনোন-সালফনিক অম্ল (anthraquinone-sulphonic acid) প্রস্তুত করিতে হয়। শেষোক্ত যৌগিক পদার্থ, পটাসিয়াম ক্লোরেট (potassium chlorate) ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় অ্যালিজারিন সৃজন করে।

৬০ c. c. জলে দ্রবীভূত ৬০ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, ২০ গ্রাম অ্যান্থ্রাকুইনোন-সালফনিক অম্লের সোডিয়ামঘটিত লবণ ২০ c. c. উষ্ণ জলে দ্রবীভূত ৪ গ্রাম পোটাসিয়াম ক্লোরেট একটি অটোক্লেভের (autoclave) মধ্যে ১৭০°তে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত উত্তপ্ত করিতে হয়। অটোক্লেভ বিশেষভাবে নির্মিত খুবই সুদৃঢ় ধাতব পাত্র এবং স্ক্রু দিয়া ইহার ঢাকনি আটকাইয়া দিলে পাত্রটি বায়ুরোধী (air-tight) হওয়ায় পাত্রস্থ দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে অত্যধিক চাপের সৃষ্টি হয় এবং চাপের সাহায্যে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শীতল হইলে বিক্রিয়ালব্ধ গলিত পদার্থ ফুটন্ত জলে দ্রবীভূত করিয়া দ্রবণ হাইড্রোক্লোরিক অম্লসংযোগে অম্লীকৃত করিয়া অধঃক্ষিপ্ত অ্যালিজারিন ছাঁকিয়া লইতে হয়। স্ট্রীম-গাহে রঞ্জন-দ্রব্য শুষ্ক করা যাইতে পারে।

অ্যালিজারিন পীতবর্ণ, উষ্ণজলে সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। ইহার ক্ষারীয় দ্রবণ রক্তবর্ণ।

S.C.E.R.T., West Bengal

॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ